ধ্রুপদী এবং নারীবাদী নীতিবীক্ষার আলোকে পক্ষপাতরাহিত্যের বিশ্লেষণ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা বিভাগে দর্শন শাস্ত্রে পিএইচ.ডি উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

গবেষক

ঋতুপর্ণা চৌধুরী

নিবন্ধন ক্রম – A00PH1100616

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপিকা অতসী চ্যাটার্জী সিনহা

দর্শন বিভাগ

যাদবপুর, কলকাতা-৩২

২০২৪

Certified that the Thesis Submitted

"ধ্রুপদী এবং নারীবাদী নীতিবীক্ষার আলোকে পক্ষপাতরাহিত্যের বিশ্লেষণ" submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Dr. Atashee Chatterjee Sinha And that neither the thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Atashee Chatterjee Sinha

Countersigned by the Supervisor:

Dated: 23.02.2024

Professor
Department of Philosophy
Jadavpur University
Kolkata - 700 032

Rituparna Choudhury

Candidate:

Dated: 23.02.2024

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

দীর্ঘ পরিশ্রম, উৎকৃষ্ট মাটির কর্ষণে যেমন জমিতে পাকা ধানের শোভা দৃষ্টিত হয়, ঠিক তেমনি আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপিকা অতসী চ্যাটার্জী সিনহা মহাশয়া, তাঁর স্নেহ ও যত্নের উষ্ণতায় এই দীর্ঘ গবেষণার দিনে আমায় লালন করেছেন। যখন গবেষণা বিষয়বস্তুর চিত্রায়ণে দিশেহারা হয়েছি, তখন তিনি কখনও মাতৃস্নেহে, কখনও বা মৃদু শাসনে আমায় পথ দেখিয়েছেন। আজ তাঁকে কৃতজ্ঞতা নয়, প্রণাম জানাতে চাই। ঈশ্বরের কাছে তাঁর সুস্থ, দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি। প্রণম্য অধ্যাপিকা শেফালী মৈত্র যিনি নারীবাদী দর্শনের স্তম্ভ ব্যক্তিত্বস্বরূপ, তাঁর প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। আমি কৃতজ্ঞ আমার স্কুলের দর্শনের শিক্ষক শ্রী ললিত চন্দ্র বর্মনের প্রতি, তাঁর স্নেহছায়াতেই আমার দর্শনকে প্রথম চেনা। আমি ঋণী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সেই সমস্ত অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের প্রতি যাঁদের জ্ঞানরসে সিঞ্চিত হয়ে আমার চিন্তাভাবনার ক্রমবিকাশ ঘটেছে। প্রণাম জানাই অধ্যাপিকা শ্রীমতি রূপা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়াকে।

মা-বাবার ঋণ শোধ করার নয়। তাঁদের অদম্য ও অকৃত্রিম উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা আমার চলার পথের পাথেয় হয়েছে। নিকট অতীতে যে অতিমারীর ভয়াবহতা গোটা বিশ্বকে গ্রাস করেছিল, অধিকাংশ পরিবারের ন্যায় আমিও সেই মারণ রোগের নিষ্ঠুরতার সাক্ষী হয়েছি। সেই সময় ওঁদের শারীরিক অসুস্থতা ও জীবনের অনিশ্চয়তা আমায় অন্তরঙ্গে বিদ্ধ করেছে, ধস্ত করেছে বারংবার। কিন্তু তাঁদের নিবিড় ভরসা ও হৃদয়ের উষ্ণতায় আমার কাজের চলমানতা বহাল থেকেছে। আমার প্রতি তাঁদের প্রত্যয় আজও অনড়। সেই সমস্ত গুরুজন যাঁদের আন্তরিক আশীর্বাদ আমাকে ঋদ্ধ করেছে, তাঁদের আজ প্রণাম জানাই।

বর্তমান যুগে আধুনিকতার ছোঁয়ায় বেশিরভাগ মানুষই যান্ত্রিক পটুত্ব অর্জন করেছে, কিন্তু স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, আমি আজও এই বিষয়ে পুরনোপন্থীই রয়ে গিয়েছি। কলমের

আঁচড়ে কাগজে আমার গবেষণার বিষয়টিকে চিত্রায়িত করতে আমি সাবলীল ছিলাম ঠিকই, কিন্তু সেটিকে পরিপূর্ণতা দিতে পেরেছি আমার প্রিয় বন্ধু সৌমেন করণের অক্লান্ত সহযোগিতায়। বিদেশের কর্মব্যস্ত জীবনকে উপেক্ষা করে যে সবসময় আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছে। তার নিরন্তর সমর্থনে আমি আপ্লুত। আমি ঋণী ভ্রাতৃপ্রতীম দেবজ্যোতি নস্কর, বাপ্পাদিত্য দাস, পিঙ্কু মন্ডল, মোস্তাকিন হোসেন- এদের প্রতি, যেকোনো সমস্যায় যারা নির্দ্বিধায় আমার পাশে থেকেছে। পরিবারের দুই ক্ষুদে সদস্য, আমার প্রিয় বোনঝি ও বোনপো যাদের অবিরাম তাগাদা আমার কাজে উৎসাহ যুগিয়েছে, অনেকটা ভালোবাসা রইল তাদের জন্য।

শেষবেলায় যে দুজন মানুষের অভাব আজ ভীষণ উপলব্ধি হচ্ছে তাঁরা আমার দিদান ও কাকিমা, যাঁরা জীবন-মরণের সীমানা ছাড়িয়ে না ফেরার দেশে পাড়ি দিয়েছেন। তাঁদের গভীর আস্থা ও অনুরাগ আমাকে সৃজন কার্যে শক্তি যুগিয়েছে অবিরত। তাঁদেরকে উৎসর্গ করছি আমার এই সৃষ্টি। মঙ্গলময় ঈশ্বরের প্রতি আমার প্রণতি জানিয়ে বলতে চাই-

"বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো,
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও।"

Rituparna Choudhury
23.02.2024.

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
ভূমিকা		১-১৪
প্রথম অধ্যায়ঃ	ধ্রুপদী নীতিবিদ্যায় পক্ষপাতরাহিত্য	১৫-৩৩
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ	নারীবাদী দর্শন অনুসারে পক্ষপাতরাহিত্য	৩৪-৬২
তৃতীয় অধ্যায়ঃ	নারীবাদী নীতিবিদ্যার আঙ্গিকে কান্ট ও রলসের তত্ত্বের পুনর্পাঠ	৬৩-৮৫
চতুর্থ অধ্যায়ঃ	বার্নার্ড গার্টের ভাবনায় পক্ষপাতরাহিত্য: একটি নৈতিক মূল্যায়ন	৮৬-১১৪
উপসংহার		১১৫-১২৬
গ্রন্থপঞ্জি		১২৭-১৩৫

ভূমিকা

প্রাচীনকাল থেকে পাশ্চাত্য দর্শন চিন্তায় মানুষের বৌদ্ধিকতা বা rationality কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করে এসেছে। দার্শনিক, জ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন বুদ্ধির গুরুত্ব অপরিহার্য বলে স্বীকার করেছেন, তেমনি নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রেও বুদ্ধি বা প্রজ্ঞাকেই সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। মূলস্রোতের অধিকাংশ নীতিতত্ত্বেই Pure Reason অর্থাৎ বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাকে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া হয়। বৌদ্ধিকতার অনুষঙ্গে যে বিষয়গুলি অপরিহার্যরূপে উপস্থিত হয় সেগুলি যথাক্রমে- পক্ষপাতরাহিত্য, বিমূর্ততা, বিষয়তা, সর্বজনীনতা, নৈর্ব্যক্তিকতা, বিচ্ছিন্নতা প্রভৃতি। ফলত নৈতিক সিদ্ধান্ত ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রগুলিতে আবেগ, অভিজ্ঞতা, প্রসঙ্গ, সহমর্মিতা এবং সদৃশ বিষয়গুলি বর্জিত হয়েছে। বুদ্ধিবাদী দার্শনিক যে সকল বৈশিষ্ট্যকে মর্যাদা দিয়ে থাকেন তার মধ্যে নৈতিক কর্তার পক্ষপাতরহিত (Impartial) অবস্থান বিষয়টি বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

পক্ষপাতরাহিত্যের (Impartiality) ধারণাটির একটি বিস্তৃত পরিধি বর্তমান। সাধারণভাবে এটি ন্যায্যতার একটি নীতি (Justice principle)। ন্যায় প্রতিষ্ঠা বা নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে পক্ষপাতরহিত থাকার অর্থ হল- নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা নৈতিক দ্বন্দ্ব নিরসনের ক্ষেত্রে যে মানদণ্ড নির্ধারিত হবে তা অবশ্যই বিষয়গত এবং নৈর্ব্যক্তিক হবে। পক্ষপাতরাহিত্য একটি আকারগত ধারণা, কখনও বা কর্তার গুণ, আবার কখনও একটি নৈতিক মূল্যায়ন পদ্ধতির সহায়ক এবং একটি মানদন্ড। এককথায় পক্ষপাতরহিত থাকার অর্থ যেকোনও প্রকারের ব্যক্তিসাপেক্ষ ও অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ উপাদানের প্রভাব, পক্ষপাত বা সংস্কার মুক্ত থাকা।

মূলস্রোতের অধিকাংশ নীতিতত্ত্বে, নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে কর্তার আদর্শ স্থির করার প্রসঙ্গে পক্ষপাতরাহিত্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আদর্শরূপে বা নৈতিক কর্তার আবশ্যিক গুণরূপে পক্ষপাতরাহিত্যের গ্রহণযোগ্যতা এবং বাস্তব জীবনে এর প্রায়োগিক উপযোগিতা বিষয়ে একটি

পর্যালোচনা করাই এই গবেষণা সন্দর্ভের লক্ষ্য। বিশেষরূপে নারীবাদী দর্শন ও চিন্তনের আলোকে আলোচনা করার প্রয়াস হয়েছে।

মূলস্রোতের প্রভাবশালী দার্শনিক তত্ত্বগুলিতে ব্যক্তি শরীরের তুলনায়, মন অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ধ্রুপদী পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে বুদ্ধিবাদী মতের আধিপত্য এবং সেই মতে জ্ঞান তথা নৈতিকতার অনুষঙ্গে ব্যক্তির শরীর, তার অভিজ্ঞতা, আবেগ, ইতিহাস, প্রেক্ষাপট সবই গৌণ। বিশুদ্ধ জ্ঞান কেবল মন দ্বারাই প্রাপ্ত, আর সেই মনকে বিদেহীরূপে উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত করে যথার্থ তত্ত্ব গঠন করাই দার্শনিকের অভিপ্রায়। পাশ্চাত্য দর্শনে নারীর প্রজ্ঞার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়নি। এখানে নারীর মানসিক ঋদ্ধির ব্যাপ্তি খুবই সীমিত বলে মনে করা হয়। আর সেই কারণেই জ্ঞান আহরণ, যুক্তি প্রয়োগ বা নৈর্ব্যক্তিক নৈতিক বিচারের প্রসঙ্গে নারী প্রতিবন্ধকরূপে দর্শিত হয় বেশীরভাগ মূলস্রোতের দার্শনিক তত্ত্বে।

দর্শনের জগতে লিঙ্গ-নিরপেক্ষতা এবং রাজনৈতিক অতিবর্তিতা সম্পূর্ণ কাল্পনিক একথা নারীবাদী মনে করেন। তাঁরা দাবী করেন যে, জ্ঞান ও জ্ঞানলাভের পদ্ধতি, পিতৃতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত। জ্ঞানের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠার আদর্শগুলি যদি পুরুষালী হয়, তবে জ্ঞানের বিষয়বস্তুও, লিঙ্গ নিরপেক্ষ না হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে জ্ঞানীয় স্তরে, এই লিঙ্গ বৈষম্যমূলক রাজনীতি সর্বদা প্রকট হয় না। তত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে এই রাজনীতিকে, গোপন করার এহেন কৌশলকে ফ্যালোসেন্ট্রিজম (Phallocentrism) বা শিশ্নকেন্দ্রিকতা নামে অভিহিত করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় মননের স্তরে একপ্রকার রাজনীতি করা হয়, যেখানে আপাত দৃষ্টিতে ‘মানব’ শব্দটিকে ঘোষিতরূপে লিঙ্গ নিরপেক্ষ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। এক্ষেত্রে দেখানো হয় মানবের পরিধির বা গণ্ডির মধ্যে পুরুষ, নারী এবং অপর সকল যৌন বর্গই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বলাবাহুল্য, বাস্তবে এই ‘মানব’ শব্দটির মাধ্যমে কেবলমাত্র পুরুষ, বিশেষত ক্ষমতাসম্পন্ন, বিসমকামী পুরুষকেই বোঝানো হয়ে থাকে এবং এই প্রকার পুরুষের মতামতকেই যথার্থরূপে ধার্য করা হয়। নারীবাদ অনুসারে, অধিকাংশ

ধ্রুপদী দার্শনিক তত্ত্বই শিশ্নকেন্দ্রিক, কারণ মূলস্রোতের সিংহভাগ তত্ত্বগুলির মধ্যেই নারী তথা প্রান্তিক বর্গের মানুষের অবস্থান অবহেলিত, অদৃশ্য।

অধিকাংশ ধ্রুপদী নীতিতত্ত্বে নৈতিকতার মানদন্ড নির্ধারণের ক্ষেত্রে, কেন পক্ষপাতরাহিত্যকে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় সেই বিষয়ক আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে, মূলস্রোতের নৈতিকতার স্বরূপ বিষয়ে কিঞ্চিত আলোকপাত করা প্রয়োজন। প্রথম অধ্যায়ে মূলত যে দুজন ধ্রুপদী নীতিদার্শনিকের মত সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে তাঁরা হলেন- জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট এবং মার্কিন নীতিদার্শনিক জন রলস। বুদ্ধিবাদী দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪), নৈতিক চিন্তনের ক্ষেত্রে পক্ষপাতরাহিত্যকে একটি অবশ্য পূরণীয় শর্তরূপে বিবেচনা করেছেন। কান্টীয় নৈতিক ভাবনার সার কথাই হল- সর্বদা কর্তব্যের জন্যই নিঃশর্ত কর্তব্য করা উচিত। তিনি নৈতিক কর্তব্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বার্থ, উপযোগিতা, ভাবাবেগ, প্রসঙ্গ প্রভৃতি ব্যতিরেকে একটি বিচার-ব্যবস্থা স্থাপনের মত দিয়েছেন। কান্ট সকল প্রকার নৈতিক বিধির উৎসরূপে বিশুদ্ধ বুদ্ধিকে (Pure Reason) স্বীকার করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে প্রতিটি মানুষের নিজস্ব ব্যবহারিক বুদ্ধি নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মানদন্ড স্বরূপ, এবং সেই বুদ্ধির বিশুদ্ধ অর্থাৎ অভিজ্ঞতা, আবেগ নিরপেক্ষ হওয়া আবশ্যক। কান্ট কর্তব্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে একপ্রকার নিঃশর্ত অনুজ্ঞা বা নিঃশর্ত আদেশের কথা উল্লেখ করেন। তিনি মনে করেছেন, এই নিঃশর্ত অনুজ্ঞা বা আদেশ পালন করার পশ্চাতে রয়েছে, মানুষের শুভ বুদ্ধিপ্রসূত সৎ-সঙ্কল্প বা Good will, যার বলে মানুষ ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তন, ভাবাবেগ, কামনা-বাসনা, উপযোগিতাকে উপেক্ষা করে বিশুদ্ধ প্রায়োগিক বুদ্ধির সাহায্যে নিঃশর্ত অনুজ্ঞা পালনে ব্রতী হয়ে, যথার্থরূপে নৈতিক মননশীল হয়ে ওঠে। কান্ট আবেগ, স্নেহ, ভালোবাসা, দরদ প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিগুলিকে অস্বীকার না করলেও নৈতিকতার প্রেক্ষাপটে এদের গুরুত্ব স্বীকার করেননি।

মার্কিন আইনবিদ তথা রাজনৈতিক দার্শনিক জন রলস-এর মতানুসারে, ন্যায়নিষ্ঠ হওয়ার একমাত্র পন্থা হল যুক্তিপরায়ণতা। রলস (১৯২১-২০০২) যে আদর্শ নৈতিক সমাজের কথা বলেছেন, সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তির সমান অধিকার থাকা বাঞ্চনীয়। তিনি যথার্থ নৈতিকতার মানদন্ড নির্ধারণের ক্ষেত্রে দুটি মৌলিক সূত্র বা ভিন্ন নীতির অবতারণা করেন। প্রথম নীতি অনুসারে, সমমানের মৌলিক স্বাধীনতার (equal basic liberty) পূর্ণ এবং পর্যাপ্ত ব্যবস্থার প্রতি সকল ব্যক্তির সমান ও স্থায়ী অধিকার থাকা আবশ্যক। দ্বিতীয় নীতি অনুসারে, সমাজের উদ্‌বৃত্তকে এমনভাবে বন্টন করতে হবে যাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক অসাম্য দূর করে সকলের মঙ্গল সাধন করা সম্ভবপর হয়। এছাড়াও যেসকল পদ অসম সুবিধা প্রদান করে, সেই সকল পদ অর্জন করার প্রতিযোগিতাকে, সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির অংশগ্রহণের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে। এই দুই প্রকার নীতির সাহায্যেই একটি যথার্থ সামাজিক পরিকাঠামো নির্ধারণ করা সম্ভব হবে। বৌদ্ধিক এবং যৌক্তিক মানুষ, উক্তপ্রকার নীতি অনুসরণ করে সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ, বিমূর্ত নৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবে। রলস এই নীতিগুলিকে পক্ষপাতমুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে, একপ্রকার অজ্ঞতার আবরণ (Veil of Ignorance) এর উল্লেখ করেন, যার সাহায্যে প্রত্যেক ব্যক্তি সকল প্রকার সাপেক্ষতা, প্রাসঙ্গিকতা ছাপিয়ে যেতে সমর্থ হবে। এর মাধ্যমে প্রত্যেক নৈতিক কর্তা নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থান, শ্রেণী, যোগ্যতা, শুভ-অশুভের ধারণা, মানসিক প্রবৃত্তি প্রভৃতি সকল প্রকার ব্যক্তিনিষ্ঠ বিষয়কে আবরিত করে রাখবে এবং সকল প্রকার মূর্ত চিন্তন, সাপেক্ষ ভাবাবেগের ঊর্ধ্বে গিয়ে পক্ষপাতরহিত, বিমূর্ত যথার্থ নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। সুতরাং নৈতিক কর্তার আদি অবস্থানটি (Original Position) হবে নিরপেক্ষ, পক্ষপাতমুক্ত। বৌদ্ধিকতা এবং যুক্তি রলসের তত্ত্বে এমনভাবে শীর্ষস্থান পেয়েছে, যেন যা কিছু যৌক্তিক নয় তাই অনৈতিক। যুগে যুগে দার্শনিকগণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিকে, নৈতিক বিধি

ও নীতির বৈধকরণ প্রক্রিয়ার ভিত্তিরূপে বর্ণনা করেছেন। রলসও ন্যায্যতার প্রসঙ্গে এই নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্বকে স্বীকার করেছেন।

গবেষণার দ্বিতীয় অধ্যায়ে নারীবাদী নীতিতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে পক্ষপাতরাহিত্যের অবস্থান বিচারের প্রয়াস করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে জৈবিক পার্থক্যের ভিত্তিতে নারী ও পুরুষের মধ্যে যৌনভেদ বর্তমান। কিন্তু আমাদের সমাজ এই যৌনভেদকে, একপ্রকার লিঙ্গপ্রভেদের আকার প্রদান করে বৈষম্যের সৃষ্টি করেছে। সাধারণত অধিকাংশ সমাজে পুরুষকে দৃঢ়, সাহসী, আক্রমণাত্মক প্রভৃতি গুণের অধিকারীরূপে উপস্থাপন করা হয়। অপরদিকে নারীকে চিহ্নিত করা হয় ত্যাগ, মমত্ব, যত্নপরায়ণতা, বিনয় প্রভৃতি গুণের অধিকারীরূপে। নারী ও পুরুষের যৌনপার্থক্যের উপর ভিত্তি করে, সমাজে যে লিঙ্গ-পার্থক্যের নির্মাণ করা হয়, সেই পার্থক্যের ভিত্তিতে নারী ও পুরুষের নির্দিষ্ট মূল্য নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে একপ্রকার বৈষম্যের আবির্ভাব পরিলক্ষিত হয়। এরূপ বৈষম্যের ফলস্বরূপ, পুরুষের গুণাবলীগুলিকে সর্বদা অধিক মূল্যের অধিকারীরূপে এবং নারীর গুণাবলীগুলিকে, পুরুষের অপেক্ষা দুর্বলরূপে প্রতিপন্ন করা হয়।

নারীর উপর পুরুষের আধিপত্য ও নারীকে বশ্যতার অধীনে রাখার যে প্রয়াস, তারই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বা রূপ হল 'পিতৃতন্ত্র'। এইরূপ ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন পর্যায়ে, লিঙ্গ-প্রভেদ সৃষ্টি করে, নারীর উপর পুরুষের আধিপত্য কায়েম করা হয়ে এসেছে। নারীবাদ হল, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর এইপ্রকার অবদমিত অবস্থান সম্পর্কে মানব জাতিকে সচেতন করার একটি প্রয়াস। নারীবাদের যথার্থ লক্ষ্য হল, সমাজে ব্যক্তিসত্তার স্বমূল্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে, লিঙ্গ-বৈষম্যের অবসান ঘটানো। নারীবাদের বিবিধ বক্তব্যগুলির মধ্যে এই গবেষণা পত্রে মূলত যেদিকে আলোকপাত করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে, তা হল নীতিদর্শনের ক্ষেত্রে নারীবাদী অবস্থান কিরূপ।

বিংশ শতাব্দীর আশির দশক থেকে, মূলস্রোতের দর্শনের একাধিক প্রতিষ্ঠিত ধারণাকে নারীবাদীরা লিঙ্গ-প্রেক্ষিতে বিচার করতে শুরু করেন। নৈতিকতার প্রেক্ষাপটে কিভাবে নারীর নৈতিক মননের উপর মূলস্রোতের নীতিদর্শন, পুংকেন্দ্রিকতা প্রতিষ্ঠা করেছে সেই দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন নারীবাদী নীতি-তাত্ত্বিকগণ।

মূলস্রোতের নৈতিকতায় আবেগ তথা মূর্ত চিন্তনকে অগ্রাহ্য করে, নৈতিক যৌক্তিকতা এবং বিমূর্তীকরণকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। আর এই বিমূর্তীকরণ এবং নিরপেক্ষতার প্রভাবেই, নারী সম্পর্কীয় আলোচনা মূলস্রোতের পরিধি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। নারীবাদীরা দাবি করেন, নিরপেক্ষ মানবতার আড়ালে, নারীর যাপন অভিজ্ঞতা, নৈতিক মনন এবং তার জীবন বিষয়ক নৈতিক সমস্যাগুলি, ধ্রুপদী নীতিদর্শন অবহেলা এবং অবজ্ঞা করেছে। পুরুষালী আদর্শ, নৈতিকবোধ, মানদণ্ড, চিন্তন প্রভৃতি বিষয়গুলি নামান্তরে, নিরপেক্ষ মানব-আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে মূলস্রোতের তাত্ত্বিক দর্শনে। নীতিবিদ্যায়, নারীর মনন শক্তির অবমাননার অবসান ঘটানোর স্বার্থে, নারীবাদীরা যে যে বিকল্প নীতিশাস্ত্রের উল্লেখ করেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলো দরদী নীতিবিদ্যা। এই দরদী নীতিবিদদের মধ্যে যাঁরা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন, **ক্যারল গিলিগান** এবং **নেল নডীংস্**। এছাড়াও **ভার্জিনিয়া হেল্ড**, **সারা রুডিক**, **ইভা ফিডার কিটে** প্রমুখরা উল্লেখযোগ্য। নারীবাদীরা মনে করেন, মানুষ সম্পর্কের বাঁধনে আবদ্ধ, সে কখনোই বিচ্ছিন্ন হয়ে অবস্থান করতে পারে না। বাস্তব জীবনের বিবিধ অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন কখনোই নিরপেক্ষতা, সার্বজনীনতা, বিমূর্ততা প্রভৃতির মাধ্যমে সম্ভবপর নয়। দরদী নীতিবীক্ষায় তাত্ত্বিক স্তরে নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে, ব্যক্তিসাপেক্ষ ভাবনা ও পরিস্থিতি সাপেক্ষতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। দরদী নৈতিকতায় যে নৈতিক স্বরের কথা উল্লেখ করা হয়, সেই স্বর সম্পর্কিত সত্তার কথা বলে।

ধ্রুপদী নীতিশাস্ত্রে যথার্থ নৈতিক চিন্তনের মানদন্ডরূপে নিরপেক্ষতাকে প্রতিষ্ঠা করার যে প্রবণতা বর্তমান, তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন নারীবাদী নীতিতাত্ত্বিকগণ বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন। এই

প্রসঙ্গে **মেরিলিন ফ্রিডম্যান-এর** (১৯৪৫-২০১৫) বক্তব্যকে তুলে ধরা হয়েছে। তিনি মনে করেন, এই নিরপেক্ষতার আদর্শটি দাবি করে, নৈতিক কর্তাকে বৌদ্ধিক হতে হবে এবং সর্বোপরি ব্যক্তিগত আনুগত্য, পরিকল্পনা ও আবেগ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হতে হবে। কিন্তু ফ্রিডম্যান-এর মতে, এই প্রকারের বিচ্ছিন্নতা, নিবিড় ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষতিকারক।

নিরপেক্ষ চিন্তনের ক্ষেত্রে সাধারণীকরণযোগ্যতার উপর ভরসা করা হয়ে থাকে। কিন্তু ফ্রিডম্যান-এর মতে, এইপ্রকার সাধারণীকরণের মাধ্যমে আদপে নিরপেক্ষতার মোড়কে আবৃত পক্ষপাতকে আড়াল করার প্রচেষ্টা করা হয়। এইরূপ নিরপেক্ষ বৌদ্ধিক প্রস্তাবনার মাধ্যমে সমাজের প্রভাবশালী মানুষদের দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রকাশ করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। আর সমাজের প্রান্তিক, অবহেলিত, বঞ্চিত মানুষদের পরিচয়, দৃষ্টভঙ্গী এবং অভিজ্ঞতাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভ্রান্তরূপে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। ফ্রিডম্যান মনে করেন, ধ্রুপদী নীতিদর্শনে জগতকে দেখার একমুখী দৃষ্টিভঙ্গী দেওয়া হয়। নিরপেক্ষতার আদর্শের মুখোশের আড়ালে বাস্তবত পক্ষপাত করা হয়েছে। প্রত্যেক নৈতিক কর্তার নৈতিক চিন্তন ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, অথচ ধ্রুপদী নৈতিকতায় বিভিন্ন প্রকার মানুষের নৈতিক বিচারের ভিন্নতাকে অগ্রাহ্য করে, ব্যক্তির জটিল চিন্তন প্রক্রিয়ার সরলীকরণ করা হয়।

এরপরে অপর একজন নারীবাদী আইরিশ ইয়ং-এর বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। মূলস্রোতের তত্ত্বগুলিতে নিরপেক্ষতার আদর্শকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে কিভাবে পক্ষপাত করা হয়ে থাকে, সেই বিষয়ে আলোকপাত করেন ইয়ং। ইয়ং মনে করেন, পক্ষপাতরাহিত্যের এই ধারণাটি কিছু আদর্শগত ভূমিকা পালন করলেও বাস্তবে এই ধারণার প্রয়োগ অসম্ভব এবং অনাবশ্যক। তাঁর মতে, সমাজের কেন্দ্রে অবস্থিত, ক্ষমতাসম্পন্ন শ্রেণীর মানুষ এরূপ সার্বিক, নিরপেক্ষতার দাবি করে নিজেদের একপাক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গীকে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী বলে প্রতিষ্ঠা করে এসেছে। আর সেই

তথাকথিত নিরপেক্ষতার আদর্শের মাধ্যমে নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উচ্চ-নীচ স্তরভেদযুক্ত পরিকাঠামো সুদৃঢ় হয়েছে। তিনি মনে করেছেন, ধ্রুপদী নীতিতত্ত্বে নিরপেক্ষতার আদর্শের ভিত্তিতে যেরূপ আকারগত প্রাকল্পিক তত্ত্ব গঠন করা হয়েছে, সেরূপ কাল্পনিক চুক্তি না করে, এমন একটি বাস্তব নৈতিক কাঠামো প্রস্তুত করতে হবে, যে পরিকাঠামোয় প্রত্যেকে অংশগ্রহণ করতে পারবে। ইয়ং যে নৈতিক পরিকাঠামোর উল্লেখ করেছেন সেখানে, একই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত প্রত্যেক স্বতন্ত্র ব্যক্তির স্বরের ভিন্নতাকে মর্যাদা দেওয়া হবে।

নারীবাদী নীতিতাত্ত্বিক এলিজাবেথ কিস্ মনে করেন, মানুষের বৌদ্ধিক নীতি গঠনের ক্ষমতার মতো অপরের সাথে সম্পর্কিত থাকা, সংবেদনশীল হওয়া, অপরের অবস্থা বোঝার সামর্থ্য ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরী। তিনি মনে করেন, যথার্থ নৈতিক প্রকল্পে, নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে 'Bottom-up approach' নেওয়া প্রয়োজন। নৈতিক তত্ত্ব গঠনের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা, বিমূর্ততার প্রয়োজনীয়তাকে কিস্ সম্পূর্ণরূপে খারিজ করেননি। তবে তিনি মনে করেন একটি নীতিতত্ত্বে সাম্যের খাতিরে, বৈষম্যকে প্রতিহত করার আদর্শে সমাজে ক্ষমতা ও সুবিধা থেকে বঞ্চিত, প্রান্তিক ব্যক্তিদের যাপন অভিজ্ঞতার বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক।

এই গবেষণা সন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ে দরদী নৈতিকতার আঙ্গিকে পক্ষপাতরাহিত্য বিষয়ে একটি বিচারমূলক আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মূলত কান্ট ও রলসের তত্ত্বের পুনর্পাঠ উপস্থাপনের প্রয়াস হয়েছে। যেসকল নারীবাদী দার্শনিক দরদী নীতিশাস্ত্রকে, ধ্রুপদী নীতিতত্ত্বসমূহ যথা- কর্তব্যবাদ, উপযোগবাদ প্রভৃতির একটি দৃঢ় এবং বিকল্প সম্ভাবনারূপে ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন- ভার্জিনিয়া হেল্ড। হেল্ড-এর মতে, দরদ একটি সদগুণ এবং এটির অনুশীলন করা জরুরী। দরদী নীতিবিদ্যায়, নৈতিক আবেগ যথা- সহানুভূতি, সহমর্মিতা সংবেদনশীলতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা প্রভৃতির যথার্থ মূল্য রয়েছে। হেল্ড-এর মতে তথাকথিত নিরপেক্ষ নৈতিক তত্ত্বগুলি যথা- কান্ট, রলসের নীতিতত্ত্বগুলি অপর্যাপ্ত। কারণ এই সকল তত্ত্বে

বিমূর্ততা এবং নিরপেক্ষতাকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে ব্যক্তি জীবনের মূর্ত পরিস্থিতিকে অগ্রাহ্য করা হয়। উক্তপ্রকার তত্ত্বগুলি প্রত্যেক মানুষের নির্দিষ্ট পরিস্থিতি সাপেক্ষ সমস্যাগুলির প্রতি অবিদিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কান্ট অনুগামী দার্শনিক মারসিয়া ব্যারন, হেল্ডের এই দাবিকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হয়েছেন। ব্যারন মনে করেন, নিরপেক্ষ নৈতিক তত্ত্বগুলির দুটি স্তর বা পর্যায় বর্তমান। যথা- মুখ্য স্তরের নৈতিকতা এবং গৌণ স্তরের নৈতিকতা। সমাজের মুখ্য স্তরের নৈতিকতা বলতে তিনি বুঝিয়েছেন ন্যায়নীতি গঠন এবং পালনকে। আর গৌণ স্তরের নৈতিকতা বলতে তিনি বুঝিয়েছেন স্বতন্ত্র ক্রিয়াকে (individual actions)। মুখ্য স্তরের নৈতিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনপেক্ষতা অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু নিম্ন স্তরের নৈতিকতার ক্ষেত্রে সাপেক্ষতাকে অস্বীকার করার প্রয়োজন নেই। নিরপেক্ষ নীতিতত্ত্বগুলিতেও, নিম্ন স্তরের নৈতিকতা অর্থাৎ ব্যক্তির স্বতন্ত্র, ব্যক্তিগত ক্রিয়ার ক্ষেত্রে সাপেক্ষতার স্থান স্বীকৃত হয়েছে বলে ব্যারন মনে করেন। যথার্থ নৈতিক নীতি গঠন এবং যথাযথভাবে সেগুলির পালনের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা কাম্য। কিন্তু ব্যক্তিগত কার্যের ক্ষেত্রে, নিজের পরিবার, পরিজন বা বন্ধুর প্রতি নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে, সাপেক্ষতাকে জায়গা দেওয়াই যায়। হেল্ড, ব্যারনের উক্তপ্রকার ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করেছেন। কারণ হেল্ডের মতে, একাধারে নিরপেক্ষ নৈতিক বিধি পালনের প্রতি দায়বদ্ধতা, অপরদিকে প্রিয়জনের প্রতি দরদী আচরণের অভিপ্রায়- উভয়ের মধ্যে যদি বিরোধ সৃষ্টি হয়, তাহলে সেই দ্বন্দ্ব নিরসনের উপায় ব্যারনের ব্যাখ্যায় অস্পষ্ট। তাই ভার্জিনিয়া হেল্ড দাবি করেন, যদি আমাদের নীতিতত্ত্বগুলিতে নিরপেক্ষ নীতি প্রাধান্য পায়, তাহলে ব্যক্তিকে যাপিত জগতেও সেই নিরপেক্ষতার দ্বারাই চালিত হতে হবে। নৈতিক নীতির ক্ষেত্রে অনপেক্ষতাকে প্রতিষ্ঠা করা হলে, ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও সেই অনপেক্ষতাকে বজায় রাখতে হবে, সেইক্ষেত্রে সাপেক্ষতাকে স্থান দেওয়া যাবে না। নিরপেক্ষ নীতিতত্ত্বগুলি আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের প্রতিবন্ধক। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পর্কের নিবিড়তা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়। আর যদিও বা ব্যক্তিগত সম্পর্ককে

অনুমোদন দেওয়া হয়, সম্পর্কিত সেই বিশেষ অপরের প্রতি ব্যক্তি যেন কোনভাবেই অধিক হিতসাধক আচরণ না করে, সেই দিকে সতর্ক করা হয় বারংবার। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, নিরপেক্ষ নীতিতত্ত্বগুলির প্রারম্ভ হয়েছে পক্ষপাতরহিত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। অপরদিকে, দরদী নীতিবিদ্যা গড়ে উঠেছে সম্পর্ক এবং দরদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। নডিংস্ বলেছেন, প্রায় প্রত্যেকেই আমরা কোন না কোনভাবে, কখনো না কখনো অপরের দরদী আচরণের দ্বারা উপকৃত হয়ে থাকি। এটি অবশ্য স্বীকার্য যে দরদের একটি মৌলিক এবং অপরিহার্য মূল্য বর্তমান। প্রত্যেকের বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রেই কোন না কোন ব্যক্তির দরদী মনোভাব বা আচরণের অবদান নিশ্চিতরূপে উপস্থিত। দরদী নীতিবিদ্যার সূচনা হয়, নির্দিষ্ট বা বিশেষ অপরের (Particular others), নৈতিক দাবি থেকে। যত্নশীল আচরণ করা এবং অপরের প্রতি মরমী মনোভাবাপন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে, কোন নিরপেক্ষ নৈতিক নিয়মের অনিবার্যতা থাকে না। এক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় অপরের প্রতি উদ্বেগের, প্রয়োজন হয় অপরের সমস্যা-প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিয়ে উপলব্ধি করার। সুতরাং দরদী নীতিবীক্ষায়, নিরপেক্ষ নৈতিক অনুশাসনের দ্বারা চালিত হওয়ার পরিবর্তে, অপরের প্রয়োজনীয়তা এবং উদ্বেগকে মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ করে, কার্য সম্পাদন করার কথা বলা হয়। এবারে হেল্ড মনে করছেন, উক্ত শিক্ষক পিতার পরিস্থিতির উদাহরণটিকে যদি দরদী নীতিতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পর্যালোচনা করা হয়, তাহলে একটি ভিন্ন সমাধান আসবে। উক্তপ্রকার দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে, একজন পিতার সঙ্গে তার সন্তানের সম্পর্ক অমূল্য। পিতা-সন্তানের সম্পর্কের অন্তর্গত অনুরাগ, আস্থা, আনুগত্য, বিশ্বাস প্রভৃতিগুলি উপলব্ধি করার পর, সেই ব্যক্তির মনে হতে পারে তিনি অপর কোনো প্রকার বিবেচনার অধীনস্থ না হয়ে, যথা- তাঁর পেশাগত দক্ষতাগুলি অভ্যাস করার পরিবর্তে, তিনি তাঁর সন্তানের জন্য পর্যাপ্ত সময় অতিবাহিত করবেন। পেশাক্ষেত্রের অতিরিক্ত ক্রিয়াগুলি থেকে নিজেকে বিরত রেখে, সন্তানকে বিশ্বাস, আস্থা, উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা যোগাতে সাহায্য করবেন, যাতে সেই সন্তানের একজন যথার্থ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার পথটি সুগম ও

মসৃণ হয়। কোন ব্যক্তি যদি সকলকে সমানভাবে সাহায্য করার পরিবর্তে, স্বপরিবার এবং বান্ধব পরিজনকেই সাহায্য করতে উৎসাহী হন, তাহলে সেটি দরদী নীতিবিদ্যার প্রেক্ষিতে অননুমোদনীয় নয়।

হেল্ডের মতে নিরপেক্ষ তত্ত্ব এবং দরদী নীতিতত্ত্বের ক্ষেত্রে দুটি ভিন্ন অবস্থান থেকে তত্ত্বের মূল্যকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই উভয়প্রকার তত্ত্বের মৌলিক পার্থক্যটি হল– দরদী নীতিতত্ত্বের মূল্যের উৎস হল, নির্দিষ্ট ব্যক্তিবিশেষ এবং তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক। অপরদিকে পক্ষপাতরহিত তত্ত্বাবলীর মূল্যের উৎস হল, সাধারণ ন্যায্যতার নীতিসমূহ। কান্ট তথা নিরপেক্ষতাবাদীদের জন্য নিজের পিতাকে শ্রদ্ধা করার কারণ হল, প্রত্যেক সন্তানের কর্তব্য তার মাতা-পিতাকে সম্মান করা। আবার সাপেক্ষতাবাদী তথা দরদী নীতিবিদগণ মনে করেন, একজন সন্তান তার মাতা-পিতাকে শ্রদ্ধা করে কারণ, ব্যক্তির ছোট থেকে বেড়ে ওঠার পেছনে তার মাতা-পিতার অজস্র, অনস্বীকার্য অবদান উপস্থিত। এক্ষেত্রে অপর কোন সন্তান তার পিতাকে সম্মান করে কিনা, এই বিষয়টি সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। কোনও ব্যক্তির পক্ষে তার মাতা-পিতাকে শ্রদ্ধা করা বা না করার একমাত্র ভিত্তি হবে, তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক। কোন মাতা-পিতা যদি তাদের সন্তানের প্রতি দিনের পর দিন অবমাননাকর আচরণ করে থাকেন, তাকে অবহেলা ও বঞ্চনা করে থাকেন, তাহলে সেক্ষেত্রে এরূপ তিক্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে সেই সন্তান যদি তার অভিভাবকদের অশ্রদ্ধা করে থাকে তাহলে সেইরূপ আচরণ হয়ত দোষের নয়। এক্ষেত্রে দুটি ব্যক্তির পারস্পরিক নির্দিষ্ট সম্পর্কের প্রতি মূল আলোকপাত করার কথা বলা হয়।

উদারপন্থী নারীবাদী তথা রাজনৈতিক দার্শনিক সুসান ওকিন (১৯৪৬-২০০৪), রলস-এর বক্তব্যের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হলেও ওকিন মনে করেছেন, রলস পরিবারকে নৈতিক মননের পরিণতি প্রাপ্তির প্রাথমিক প্রতিষ্ঠানরূপে চিহ্নিত করা সত্ত্বেও, পরিবারের অভ্যন্তরীণ জগতে উপস্থিত ক্ষমতার বৈষম্য, নারীর প্রতিবন্ধকতা, সীমাবদ্ধতা প্রভৃতি বিষয়গুলিতে

আলোকপাত করেননি। ওকীনের মতে তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক পরিসরে রলসের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল- রলসীয় পরিভাষায় 'আদি অবস্থান' বা 'মূল অবস্থান' (Original Position)। উনবিংশ শতকের আশির দশকের বহু নারীবাদী, রলসের এই মূল অবস্থান বিষয়ক চিন্তন পদ্ধতির বিরুদ্ধে আপত্তি প্রকাশ করেন। ওকিন তথা অপর অনেক নারীবাদী মনে করেন পরিবার হল- কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। অনপেক্ষ, ন্যায্য সামাজিক পরিকাঠামো প্রস্তুত করাই যদি ধ্রুপদী নীতিদার্শনিকের কাঙ্খিত হয়ে থাকে, তাহলে পরিবারের অভ্যন্তরীন সমস্যা, বৈষম্য, ক্ষমতার অসম বন্টন প্রভৃতি বিষয়গুলিকেও নৈতিকতার প্রেক্ষিতে গুরুত্ব আরোপ করা আবশ্যক। রলস তথা মূলস্রোতের সিংহভাগ তত্ত্ব কাঠামোয় পরিবারের অন্দরমহলে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব, বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলাকে কখনোই নৈতিকতার প্রেক্ষিতে চিহ্নিত করা হয়নি। অতএব নারীবাদী পক্ষ অবলম্বন করে বলা যায়, রলস নৈতিক ভাবাবেগকে অবহেলা, অবজ্ঞা করে নৈতিক যৌক্তিকতা ও বুদ্ধির প্রাধান্যকে স্বীকার করার মাধ্যমে আসলে পুরুষ পক্ষপাত করেছেন।

গবেষণার চতুর্থ অধ্যায়ে বার্নার্ড গার্ট-এর (১৯৩৪-২০১১) মত অবলম্বন করে বিচার করার প্রচেষ্টা হয়েছে- পক্ষপাতরাহিত্যের জটিল ও দুরূহ ধারণাটি মূলস্রোতের ভাবনায় নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর এক আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য হলেও, তার ব্যবহারিক যৌক্তিকতা নিয়ে সংশয় করার কারণ অনেক। গার্ট দাবি করেন, পক্ষপাতরাহিত্য একটি আকারসর্বস্ব, শূন্যগর্ভ শব্দ বা পরিভাষা নয়; এই ধারণার মধ্যে যে তিনটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সেগুলি হল, ১) কর্তা- অর্থাৎ যিনি নিরপেক্ষ নির্বাচন করেন, ২) অপর- যার প্রতি নিরপেক্ষ আচরণ করা হয়েছে এবং ৩) বিষয় বা ক্ষেত্র- যার প্রেক্ষিতে নিরপেক্ষ আচরণ করা হয়েছে। নৈতিকতার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ অবস্থান দাবী করার অর্থ এই নয় যে, ব্যক্তিকে সকলের প্রতি এবং সমস্ত প্রকার ক্ষেত্র নির্বিশেষে নিরপেক্ষ আচরণ করতে হবে। গার্ট নৈতিকতার প্রেক্ষিতে দুটি বিষয়ের উল্লেখ করেন, যথা- নৈতিক আদর্শ (Moral ideals) এবং নৈতিক অনুশাসন (Moral rules)। তাঁর মতে নৈতিক পরিসরে, একটি নির্দিষ্ট

গোষ্ঠীর প্রতি নৈতিক অনুশাসন পালন করার ক্ষেত্রে, একজন যথার্থ নৈতিক কর্তার সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ আচরণ করা আবশ্যক। কিন্তু কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে যদি ব্যক্তি নির্দিষ্ট একটি নৈতিক অনুশাসনের পালন করতে অসমর্থ হন এবং সেই নিয়মের লঙ্ঘনটি যদি ন্যায়সঙ্গত (justified) কারণে হয়ে থাকে, তাহলে উক্তপ্রকার লঙ্ঘনকেও নিরপেক্ষভাবে নিয়ম পালনের সমকক্ষ হিসেবে ধার্য করা হবে। নৈতিকতার প্রেক্ষিতে যে ধরনের নিরপেক্ষতা প্রয়োজনীয়, তা অবশ্যই একটি লৌকিক তন্ত্রের অংশ হবে। ক্ষেত্র বিশেষে নৈতিক নিয়মের লঙ্ঘকে নৈতিকভাবে অনুমোদন করা সম্ভব। শুধুমাত্র তখনই কোনো নৈতিক অনুশাসন লঙ্ঘন এবং নিরপেক্ষভাবে নিয়ম পালনকে সমকোটিতে ধার্য করা হবে, যখন একটি নৈতিক লৌকিক তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত বৌদ্ধিক ব্যক্তি সেই নির্দিষ্ট নিয়ম লঙ্ঘনকে ন্যায়সঙ্গতরূপে স্বীকৃতি দেবেন। গার্টের ভাষায় এগুলি “Strongly justified violations” অর্থাৎ জোড়ালো যুক্তিসম্পন্ন লঙ্ঘন। আবার যখন কোনো একটি নিয়ম লৌকিকভাবে লঙ্ঘনীয় কিনা এই বিষয়ে বৌদ্ধিক কর্তার মধ্যে মত পার্থক্যের উদ্ভব হয়, সেই পরিস্থিতিতে ব্যক্তি নিরপেক্ষ অবস্থানে থেকে নিয়মের পালন অথবা লঙ্ঘন করতেই পারেন। গার্টের ভাষায় এই লঙ্ঘনকে বলা হয় " Weakly justified violations" অর্থাৎ দুর্বল যুক্তিপূর্ণ লঙ্ঘন। গার্ট প্রদত্ত নৈতিক পক্ষপাতরাহিত্যের ব্যাখ্যার মাধ্যমে যুক্তিপূর্ণ এবং অযৌক্তিক উভয় প্রকার নিয়ম লঙ্ঘনের ক্ষেত্রগুলির একটি বস্তুগত ধারণা লাভ করা সম্ভব। গার্ট একাধারে পক্ষপাতরাহিত্যের ধারণার একটি বস্তুগত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি আবার ক্ষেত্র বিশেষে, নৈতিক দ্বন্দ্ব বা মত-বিভেদেরও একটি জায়গা উন্মুক্ত রাখতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, নৈতিক অনুশাসন পালনের ক্ষেত্রে পক্ষপাতরহিত অবস্থান আবশ্যক হলেও, নৈতিক আদর্শের ক্ষেত্রে এই নিরপেক্ষতা বাধ্যতামূলক নয়।

পরিষেশে উপসংহারে আলোচিত হয়েছে, মূলধারার নৈতিক ভাবনা এবং প্রেক্ষিত-বর্জিত পুংকেন্দ্রিক জ্ঞান ধারাবাহিকভাবে গুরুত্ব আরোপ করে এসেছে বিষয়তা, পক্ষপাতরাহিত্য,

যৌক্তিকতা, বিমূর্তায়ন প্রভৃতির উপর। ধ্রুপদী দার্শনিক পরম্পরার সমালোচনাপূর্বক নারীবাদী, নারী ও পুরুষের লিঙ্গ পরিচয় নির্মাণের ব্যাখ্যা করে দেখাতে চেয়েছেন নারী তার আদর্শ গুণসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে তার নৈতিকতা পুরুষালি বিচার বোধ, বৌদ্ধিকতা ও নিরপেক্ষতার পৃষ্ঠপোষক না হওয়ায় মূলস্রোতের দর্শনে অবমূল্যায়িত হয়েছে। তাই নারীবাদী নীতিদর্শনে পক্ষপাতরহিত, সার্বিক, বিষয়গত, নৈতিক আদর্শের পরিবর্তে আপেক্ষিক নৈতিকতার প্রাসঙ্গিকতাকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। 'Top-down' বা 'Bottom-up' উভয় ক্ষেত্রেই কোন একটি পক্ষের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অপরের অধিকার তথা কর্তব্য নির্ধারণ করে। তাই নারীবাদী নীতিবীক্ষার পরতে পরতে 'power-with-power'-এর অনুমোদন পাওয়া যায়, যেখানে ভিন্নতা সত্ত্বেও বৈষম্য বা উচ্চ-নীচ স্তরায়নের অস্তিত্ব নেই।

একটি যথার্থ সমৃদ্ধ নৈতিক পরিকাঠামো গঠন করতে হলে নিরপেক্ষ অবস্থান বিষয়ে গভীর বিচারমূলক উপলব্ধি আবশ্যক। নারীবাদী প্রমাণ করেন যে মূলস্রোতের নীতিশাস্ত্রের পক্ষপাতরাহিত্যের আদর্শটি বাস্তবে সামাজিক উচ্চ-নীচ স্তরায়ন এবং অবদমনের প্রক্রিয়াকে প্রশ্রয় দেয়। একটি যথার্থ মানবধর্মী ন্যায় পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে, এবং তার ব্যবহারিক বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পর্কের বুনন, নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতের বিশেষতা, ভিন্ন নৈতিক বোধ, উপলব্ধি এবং সদৃশ বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিতে হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য- এই গবেষণা সন্দর্ভে 'Impartiality'-এর বাংলা প্রতিশব্দরূপে, 'পক্ষপাতরাহিত্য', 'নিরপেক্ষতা', 'অনপেক্ষতা', 'প্রেক্ষিতনিরপেক্ষতা' এবং 'পক্ষপাতশূন্যতা'- এই শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে ।

প্রথম অধ্যায়

ধ্রুপদী নীতিবিদ্যায় পক্ষপাতরাহিত্য

সৃষ্টির প্রারম্ভিককাল থেকে মানব জাতিকে বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীবরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বুদ্ধিমত্তা মানুষকে অন্যান্য সকল প্রাণীকূল থেকে পৃথক করে। এই বৈশিষ্ট্যের শক্তিতে বলিয়ান হয়েই, মানুষ অর্জন করে জ্ঞানীয় ক্ষমতা, নৈতিক মূল্যবোধ এবং মর্যাদার শ্রেষ্ঠ আসন। দর্শনের জগতেও এই বুদ্ধিবৃত্তিকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে তত্ত্বায়নের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে পাশ্চাত্য দর্শন চিন্তায় মানুষের বৌদ্ধিকতা (Rationality) কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করে এসেছে। দার্শনিক যেমন জ্ঞানের ক্ষেত্রে বুদ্ধির গুরুত্ব অপরিহার্য বলে স্বীকার করেছেন, তেমনই নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রেও প্রজ্ঞাকেই সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। মূলস্রোতের দর্শনে ব্যক্তি শরীরের তুলনায় মন অধিক গুরুত্বপূর্ণ। রেনে ডেকার্ত দ্বৈতবাদ (Dualism)-এর মাধ্যমে শরীর ও মনের বৈপরীত্য তথা বিরুদ্ধ ধর্মবৈশিষ্ট্য প্রচার করেন। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে বুদ্ধিবাদী মত বলশালী হয় এবং সেই মতে জ্ঞান তথা নৈতিকতার অনুষঙ্গে ব্যক্তির শরীর, তার অভিজ্ঞতা, আবেগ, ইতিহাস, প্রেক্ষাপট সবই গৌণ। এক্ষেত্রে মনের ভূমিকা প্রধান এবং এই মনের সাহায্যেই বিশুদ্ধ জ্ঞান, যৌক্তিকতার প্রয়োগ এবং নৈতিক বিচার সম্ভব হয়। শরীর যেহেতু প্রকৃতির অংশ তাই তা প্রকৃতির নিয়মের অধীন। কিন্তু মন ও চেতনা প্রকৃতি জগতের থেকে বিচ্ছিন্ন। দর্শন এবং বিজ্ঞান নৈর্ব্যক্তিক, বিমূর্ত, সর্বজনীন, বিষয়নিষ্ঠ জ্ঞান উৎপাদনের লক্ষ্যে সকল প্রকার বিষয়িতাকে দূরে রাখতে চায়। বিশুদ্ধ জ্ঞান কেবল মন দ্বারাই প্রাপ্ত, আর সেই মনকে বিদেহীরূপে উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত করাই দার্শনিকের অভিপ্রায়।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে দেখা গেছে শরীরের সঙ্গে কেবল নারীকেই যুক্ত করা হয়, আর সেই কারণেই জ্ঞান আহরণ, যুক্তি প্রয়োগ বা নৈর্ব্যক্তিক নৈতিক বিচারের প্রসঙ্গে নারী

প্রতিবন্ধকরূপে দর্শিত হয়। কার্তেসীয় দ্বৈতবাদ, চিন্তা কাঠামোয় (conceptual framework) এমন এক পরিবর্তন কায়েম করে যার ফলে দুটি বিপরীত কোটির মধ্যে (p এবং ~p এর মধ্যে) বিরুদ্ধ সম্বন্ধ রচিত হয়। এক্ষেত্রে একটি কোটি মুখ্য বা প্রধান এবং অপরটি গৌণ বা অপ্রধান হয়ে দাড়ায়। এই কাঠামোয় মন হয় চেতন, ক্রিয়াশীল, বুদ্ধিযুক্ত এবং প্রধান। অপরদিকে শরীর হয় জড়, নিষ্ক্রিয়, অনুৎপাদনশীল এবং অপ্রধান। মূলস্রোতের দর্শনে বিশেষত ব্যক্তি-নিরপেক্ষ, বিমূর্ত, নিরালম্ব প্রেক্ষিত থেকে তত্ত্ব রচনার দৃষ্টান্তই পাওয়া যায়, কারণ বৌদ্ধিকতাকে হাতিয়ার করে বিমূর্ত চিন্তা করাই দার্শনিকের লক্ষ্য।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে সমাজে নারী ও পুরুষের ভূমিকা বিভাজিত হয়ে এসেছে। এই বিভাজনের ধরন ও কারণ সর্বদা এক নয়। বিভিন্ন ভৌগলিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পটভূমিতে নারী ও পুরুষের ভূমিকা বিভাগের ফলে তাদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত আচরণ, ধর্ম, মনন এবং আবেগ ভিন্ন ভিন্ন হয় এবং সেইসকল প্রত্যাশা পূরণের স্বার্থে, নারী-পুরুষের সৃজিত স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হয়। নারী ও পুরুষের মধ্যে কিছু জৈবিক পার্থক্য বর্তমান, যথা- তাদের দৈহিক গঠন, ক্রোমোজোমের পার্থক্য ও প্রজনন ক্ষমতার পার্থক্য প্রভৃতি। এই জৈবিক বা যৌন প্রভেদ অতিরিক্ত সমাজ নির্মিত নারী-পুরুষের যে ভেদ, তাকে বলা হয় লিঙ্গপ্রভেদ।[১] ষাটের দশক থেকে বিশ্বের নানা দেশে নারীবাদীরা এই লিঙ্গভেদ এবং তার ফলস্বরূপ ঘটে চলা লিঙ্গ-রাজনীতি প্রসঙ্গে চিন্তা ও বিচারমূলক আলোচনা করেন।

আশির দশকের শুরু থেকেই নারীবাদীগণ, দর্শন জগতের দ্বৈতবাদ বা দ্বিকোটিক বিভাজন নিয়ে বিচার করতে আরম্ভ করেন। তাঁরা দেখেন যে, দ্বৈতবাদ থেকে এক ধরনের উচ্চ-নীচ স্তরভেদ তৈরি হয়েছে। শরীর-মন, সংস্কৃতি-প্রকৃতি, মানব-নমানব, পুরুষ-নারী, বুদ্ধি-

---

[১] মৈত্র, শেফালী, *নৈতিকতা ও নারীবাদ*, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ২০০৩, পৃ. ১২২।

আবেগ, এইপ্রকার দ্বিকোটিক বিভাজন দ্বারা ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ও প্রান্তিকরণ ঘটার ক্ষেত্রে তাঁরা দ্বৈতবাদ-এর প্রচ্ছন্ন অবদান দেখতে পান। মূলস্রোতের দার্শনিক তত্ত্বগুলিতে প্রধানত দেহের সঙ্গে আবেগ এবং মনের সঙ্গে বুদ্ধি তথা যৌক্তিকতাকে অভিন্ন করে দেখার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যেহেতু ধ্রুপদী দর্শনে দেহের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট চিন্তার মধ্যে দিয়ে জ্ঞান আহরণ বা তত্ত্ব রচনা করার আবশ্যিকতা স্বীকার করা হয়, ফলত নারী ও তার শরীর এবং নারীর আবেগ-অনুভূতির দ্যোতনা দর্শনে সম্পূর্ণ তাৎপর্যহীন হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে নারীবাদী মনে করেন, বৌদ্ধিকতার সঙ্গে তথাকথিত পুরুষসুলভ গুণগুলি উচ্চ স্থান পায়। আবেগ, অনুভূতি, দেহের সঙ্গে তথাকথিত নারীসুলভ বৈশিষ্ট্যগুলিকে নিকৃষ্ট বা হেয় প্রতিপন্ন করার প্রক্রিয়াটি এক ধরনের লিঙ্গ রাজনীতি।

মূলস্রোতের দর্শনে পুরুষকেন্দ্রিক কাঠামোকে আদর্শরূপে গ্রহণ করার কারণেই পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম হয়, বাস্তবে যে তন্ত্রে পুরুষের কর্তৃত্ব এবং নারীর বশ্যতা স্বাভাবিক বলে গৃহীত হয়। সাম্প্রতিককালে অনেক নারীবাদী লিঙ্গের মতো শরীরকেও ইতিহাস, প্রেক্ষিত, যাপিত অভিজ্ঞতা, সম্পর্ক প্রভৃতির মধ্য দিয়ে গড়ে তোলার কথা বলেন। বিশ্লেষণের প্রয়োজনে গোড়ার দিকে যৌন-স্বরূপ এবং লিঙ্গ-স্বরূপের পার্থক্য করলেও পরবর্তীতে নারীবাদী এই দুটি প্রকারের মধ্যে বাস্তবিক কোন অনতিক্রম্য বিভাজন স্বীকার করেননি।

জ্ঞানের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রজ্ঞা বা বৌদ্ধিকতার (Reason) ভূমিকা অপরিসীম। জ্ঞানতত্ত্বে পুরুষতন্ত্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই বৌদ্ধিকতার মাধ্যমে। দর্শনের জগতে লিঙ্গ নিরপেক্ষতা এবং রাজনৈতিক অতিবর্তিতা সম্পূর্ণ কাল্পনিক একথা নারীবাদী মনে করেন। তাঁরা দাবী করেন যে, জ্ঞান ও জ্ঞানলাভের পদ্ধতি পুরুষতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত। **জেনেভিয়েভ লয়েড**

(Genevieve Lloyd) তাঁর *The Man of Reason* (1979)[২] গ্রন্থে তত্ত্ব নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রায়োগিক বৌদ্ধিকতার স্বরূপ বিচার করেছেন এবং তার পুরুষালী প্রকৃতিকে তুলে ধরেছেন। সপ্তদশ শতকের যুক্তিসম্পন্ন পুরুষ দার্শনিকগণের মনন পর্যালোচনা করে লয়েড তাঁর গ্রন্থে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যে, ধ্রুপদী রীজন একান্তভাবে পুরুষের সম্পদ। জ্ঞানের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠার আদর্শগুলি যদি পুরুষালী হয়, তবে জ্ঞানের বিষয়বস্তুও লিঙ্গ-নিরপেক্ষ না হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে জ্ঞানীয় স্তরে এই লিঙ্গ-বৈষম্যমূলক রাজনীতি সর্বদা প্রকট হয় না। তত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে অনেক সময় এই রাজনীতিকে আড়াল বা প্রচ্ছন্ন করে রাখা হয়। এহেন গোপন করার কৌশলকে ফ্যালোসেন্ট্রিজম বা শিশ্নকেন্দ্রিকতা (Phallocentrism) নামে অভিহিত করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় মননের স্তরে একপ্রকার রাজনীতি করা হয়, যেখানে আপাত দৃষ্টিতে 'মানব' শব্দটিকে ঘোষিতরূপে লিঙ্গ-অনপেক্ষ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। এক্ষেত্রে দেখানো হয় মানবের পরিধির বা গন্ডীর মধ্যে পুরুষ, নারী এবং অপর সকল যৌন বর্গই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বলাবাহুল্য বাস্তবে এই 'মানব' শব্দটির মাধ্যমে কেবলমাত্র পুরুষ, বিশেষত ক্ষমতাসম্পন্ন, বিসমকামী পুরুষকেই বোঝানো হয়ে থাকে এবং এইপ্রকার পুরুষের মতামতকেই যথার্থরূপে ধার্য করা হয়। বুদ্ধিবৃত্তি নামক ধর্মের নিরিখে মানুষকে চিহ্নিত করার অভ্যাস পুরুষতান্ত্রিক সমাজ দ্বারা সৃজিত। নারীবাদ অনুসারে সিংহভাদ ধ্রুপদী দার্শনিক তত্ত্বই শিশ্নকেন্দ্রিক, কারণ মূলস্রোতের অধিকাংশ তত্ত্বসমূহেই নারী তথা প্রান্তিক বর্গের মানুষের অবস্থান অবহেলিত, উপেক্ষিত এবং অদৃশ্য। চিরায়ত তত্ত্বে প্রজ্ঞা বা বৌদ্ধিকতাকে জ্ঞানের স্তম্ভস্বরূপ বলা হয়। ধ্রুপদী তত্ত্বের রীজন যে একটি লিঙ্গ-লাঞ্ছিত সামাজিক নির্মাণ, ইতিহাস তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

[২] Lloyd, Genevieve. *The Man of Reason*, Vol. 10, No. 1, January 1979.

ধ্রুপদী নীতিদর্শন বিশেষত বুদ্ধিবাদী ভাবনায়, বিমূর্তীকরণ পন্থা যথার্থ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। নৈতিক দ্বন্দ্ব নিরসনের ক্ষেত্রে মূর্ত চিন্তন, ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গী, অভিজ্ঞতা, আবেগের তুলনায় বৌদ্ধিকতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। মূলস্রোতের অধিকাংশ নীতিতত্ত্বেই Pure reason অর্থাৎ বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। ফলে নৈতিক সিদ্ধান্ত ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রগুলিতে আবেগ, অভিজ্ঞতা, প্রসঙ্গ, সহমর্মিতা প্রভৃতি বিষয়গুলি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। ধ্রুপদী নৈতিক ভাবনায়, বৌদ্ধিকতার অনুষঙ্গে যে বিষয়গুলি অপরিহার্যরূপে উপস্থিত হয় সেগুলি ক্রমে- পক্ষপাতরাহিত্য বা নিরপেক্ষতা, বিমূর্ততা, বিষয়তা, সার্বজনীনতা, নৈর্ব্যক্তিকতা, বিচ্ছিন্নতা প্রভৃতি। মূলস্রোতের নীতিশাস্ত্রে মানুষকে নৈতিক জীবনযাপনের জন্য সার্বিক, বিমূর্ত নীতি বা বিধি অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

নারীবাদীরা মনে করেন, যেহেতু মূলস্রোতের নৈতিকতা মূলত বৌদ্ধিকতার প্রশ্নের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে, সেহেতু এক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয়েছে মানুষ মাত্রই বৌদ্ধিক জীব। এইরূপ পূর্বশর্ত স্বীকার করে মূলস্রোতে যে নৈতিক তাত্ত্বিক পরিকাঠামো গঠিত হয়েছে, তাতে মানব সমাজের হিত সাধনের আড়ালে বাস্তবত একপ্রকার লিঙ্গ-পক্ষপাত করা হয়েছে। মূল ধারার নৈতিক ভাবনা এবং প্রেক্ষিত-বর্জিত পুংকেন্দ্রিক জ্ঞান ধারাবাহিক ভাবে গুরুত্ব আরোপ করে এসেছে পক্ষপাতরাহিত্য, যৌক্তিকতা, বিমূর্তায়ন প্রভৃতির উপর। চিরাচরিতভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে, দার্শনিকগণ বৌদ্ধিকতা বা যুক্তির সঙ্গে পুরুষের এবং আবেগের সঙ্গে নারীর সম্পর্ক স্বীকার করে নিয়ে মূলস্রোতের নীতি-তাত্ত্বিক পরিকাঠামো নির্মাণ করতে উদ্যত হয়েছেন। সুতরাং চিরায়ত দার্শনিকগণ হয় অজ্ঞতাবশত অথবা ইচ্ছাকৃত ভাবে নারীর প্রসঙ্গটিকে বাদ রেখে দর্শন চর্চা করেছেন এবং নিরপেক্ষ মানবতার আড়ালে আদপে পুরুষ পক্ষপাতদুষ্টতা পোষণ করেছেন। তাই যুক্তি ভিত্তিক এই ধ্রুপদী নৈতিকতায় পক্ষপাতশূন্যতা বা নিরপেক্ষতা, সার্বজনীনতা, বিমূর্তিকরন প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য গুলির মাধ্যমেই বাস্তবে পুরুষ-পক্ষপাত

প্রকট হয়েছে এবং এই তথাকথিত নিরপেক্ষতার প্রভাবে নারীর উৎকর্ষের পতন ঘটেছে। এই প্রকার নীতিশাস্ত্র, ব্যক্তির বিশেষ পরিস্থিতি বা অবস্থান বিষয়ে উদাসীন থাকার নির্দেশ দেয়। কারণ এক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয় যেকোন রূপ ব্যক্তিসাপেক্ষ ভাবনা, আবেগ, অনুভূতি নৈতিক বিচারে গুরুত্বহীন। অধিকাংশ ধ্রুপদী নীতিতত্ত্বে উল্লেখ করা হয় জ্ঞাতা, জ্ঞানের বিষয়, জ্ঞান লাভের পদ্ধতিকে নৈর্ব্যক্তিক হতে হবে, তবেই যথার্থ জ্ঞান লাভ সম্ভব। পক্ষপাতরহিত জ্ঞানই হল জগতের প্রকৃত জ্ঞান। এইপ্রকার জ্ঞান সম্পন্ন মানুষ, তাঁর জ্ঞানবুদ্ধিতে যে নৈতিক মূল্যায়ন করবেন তাই হবে নৈতিকতার সর্বশ্রেষ্ঠ মানদন্ড। একথা অনস্বীকার্য যে, মানুষের জীবনে জ্ঞান এবং কর্ম অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত এবং উভয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ। জ্ঞানের ক্ষেত্রে দর্শনবীক্ষা যেসকল বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করে সেগুলি ক্রমে- জ্ঞানের স্বরূপ, জ্ঞানের উৎস, জ্ঞানলাভের পদ্ধতি এবং জ্ঞানের পরিধি। আবার কর্ম বিষয়ে নীতিদর্শনের চর্চিত প্রসঙ্গগুলি হল- ব্যক্তির নৈতিক কর্তব্য, শুভাসুভ বাধ্যবাধকতা, নৈতিক বিধি এবং নৈতিক বোধের উৎস। মূলস্রোতের অধিকাংশ নৈতিক ভাবনায় তত্ত্ব গঠনের ক্ষেত্রে, নৈতিকতার যথার্থ মানদন্ড বা আদর্শ স্থির করার বিষয়ে 'পক্ষপাতরাহিত্য' (Impartiality) একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। পক্ষপাতরাহিত্যের এই আদর্শটির গ্রহণযোগ্যতা এবং বাস্তব জীবনে এটির প্রায়োগিক উপযোগিতা বিষয়ে একটি বিচারমূলক আলোচনা জরুরী।

পক্ষপাতরাহিত্যের ধারণাটির একটি বিস্তৃত প্রায়োগিক পরিধি আছে।[৩] বৃহত্তর অর্থে পক্ষপাতরাহিত্য একটি আকারগত ধারণা, যার অর্থ যেকোন প্রকারের পক্ষপাতমুক্ত থাকা। সাধারণভাবে এই নিরপেক্ষতা, জ্ঞান লাভের এক আবশ্যিক শর্ত এবং ন্যায্যতার একটি নীতি। ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে পক্ষপাতশূন্যতাকে প্রয়োগ করার অর্থ, নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা নৈতিক

[৩] Jollimore, Troy, 2021, "Impartiality." Stanford Encyclopedia of Philosophy, https://plato.stanford.edu/entries/impartiality/ (online source), cited on 05/01/2022.

দ্বন্দ্ব নিরসনের ক্ষেত্রে যে মানদণ্ড নির্ধারিত হবে, তাকে অবশ্যই বিষয়গত এবং নৈর্ব্যক্তিক হতে হবে। 'নিরপেক্ষতা' শব্দটির মাধ্যমে নৈতিকতার সঙ্গে সংযুক্ত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি সদর্থক ধারণা লাভ করা যায়। তবে এই নিরপেক্ষতার ধারণাটি হয়তো নৈতিকতার সঙ্গে অভিন্ন নয়, কিন্তু বলাবাহুল্য এই দুটি বিষয় পরস্পর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। তথাপি মাথায় রাখতে হবে, এই নিরপেক্ষতা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। নৈতিকতার পরিধির বাইরেও অনেক সময় নিরপেক্ষতার আদর্শকে ব্যবহার করা যায়, কিন্তু তাকে নৈতিক নিরপেক্ষতা বলা যায় না। কোন ব্যক্তি নিরপেক্ষ আচরণ করেও অনৈতিক হতে পারেন। একটি অনপেক্ষ নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন প্রকারের নৈতিক বিবেচনা না থাকলে তা নৈতিক অর্থে পক্ষপাতশূন্য হিসেবে গৃহীত হয় না।

ধরা যাক্ একজন ব্যক্তি, তার ব্যক্তিগত সম্পত্তির হিসেব রাখার জন্য একজন হিসাব রক্ষক (Accountant) নিয়োগ করার পরিকল্পনা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি নিয়োগ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় সকল অংশগ্রহণকারীদের বয়স, লিঙ্গ, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সকল বৈশিষ্ট্য বাদ দিয়ে কেবলমাত্র কাজের পারদর্শিতার নিরিখে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকেই নির্বাচন করলেন। বলা যেতেই পারে যে এক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন করেছেন। কিন্তু এই প্রকার বিচার নৈতিক নিরপেক্ষতা (moral impartiality) নয়। ব্যক্তির কৃতকর্ম কোন কিছুর নিরিখে নিরপেক্ষ হওয়ার অর্থ এমন নয় যে, সেটি নৈতিকতার প্রেক্ষিতেও নিরপেক্ষ বলে গ্রাহ্য হবে। কারণ নিরপেক্ষতার ধারণাটি কেবলমাত্র নৈতিকতার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। পক্ষপাতরহিত হয়ে কোন নির্বাচন করার অর্থ হল বিশেষ কোনরূপ বিবেচনার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে নির্বাচন করা, অর্থাৎ কোন ব্যক্তির বিশেষ কোনপ্রকার গুণ বা ক্ষমতার প্রভাব অথবা কারো প্রতি বিশেষ অনুরাগ, স্নেহ, আবেগ প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে, নিরপেক্ষ নির্বাচন করা।

পক্ষপাতশূন্যতা এমন এক ধারণা যার সাহায্যে মূলস্রোতের দর্শনে জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞানের প্রক্রিয়াকে বিশেষিত করা হয়। জগৎ, জীবন, মানুষ ও মূল্য বিষয়ক জ্ঞান তথা নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে পক্ষপাতশূন্যতার ভূমিকা অপরিসীম। আইন ও নৈতিক নীতি বা বিচার পদ্ধতিতে এই নিরপেক্ষতা আবশ্যক বলে মনে করা হয়। যেকোন কর্ম ন্যায্য বা নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে অনুমোদন পাওয়ার জন্য তা সর্বজনীন ও বিষয়গত হওয়া জরুরী বলে দার্শনিক দাবি করেন। নিরপেক্ষতাই সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিসরে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করতে সহায়ক হয়। ব্যক্তির ইতিহাস, প্রেক্ষিত, যাপিত অভিজ্ঞতা, আবেগ এবং ব্যক্তিগত পছন্দ ব্যতিরেকে নিরপেক্ষতা, জ্ঞান ও নৈতিক বিধির বৈধতা প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে। নৈতিক বিধি বা নীতির ক্ষেত্রে পক্ষপাতশূন্যতা ব্যক্তির নিজস্ব বিশ্বাস, সংস্কার, অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, চিন্তা প্রভৃতি সকল বিষয়িতাকে সরিয়ে রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্দেশ দেয়। কোন বিশেষ প্রেক্ষিত, দৃষ্টিভঙ্গি বা অবস্থান গ্রহণ করার অর্থ হল সাপেক্ষতাকে স্থান দেওয়া। মূলস্রোতের দর্শনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, বিষয়তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে পক্ষপাতশূন্যতাও বৌদ্ধিকতার এক অপরিহার্য অঙ্গরূপে দৃশ্যমান। অধিকাংশ ধ্রুপদী নীতিতত্ত্বে নৈতিকতার মানদন্ড নির্ধারণের ক্ষেত্রে পক্ষপাতরাহিত্যকে কেন অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় সেই বিষয়ক আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে, মূলস্রোতের নৈতিকতার স্বরূপ বিষয়ে কিঞ্চিত আলোকপাত করা প্রয়োজন।

মূলস্রোতের নৈতিকতার স্বরূপ এবং আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য- প্রথমেই উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রে মূলস্রোতের নীতিদর্শন বলতে সেই সকল তত্ত্বকে বোঝানো হচ্ছে, যেক্ষেত্রে জ্ঞান অর্জন এবং নৈতিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বৌদ্ধিকতাকে (Reason) প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এইপ্রকার নৈতিকতা মূলত ন্যায়নিষ্ঠ (Justice based)। এক্ষেত্রে বিষয়তানিষ্ঠ প্রসঙ্গ-নিরপেক্ষতাকে সকল প্রকার নৈতিক সমস্যা সমাধানের নির্ভরযোগ্য পন্থারূপে স্বীকার করা হয়। মূলস্রোতের নৈতিকতা মূলত বৌদ্ধিকতার উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। সুতরাং অধিকাংশ ধ্রুপদী

নৈতিক তত্ত্বগুলিতেই আবেগ বা সহমর্মিতার তুলনায়, বৌদ্ধিকতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। যেকোন প্রকার জ্ঞান অনুসন্ধান বা উপলব্ধির ক্ষেত্রে, বৌদ্ধিকতাকেই শ্রেষ্ঠ বিচারকরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এরূপ নৈতিক তত্ত্বগুলি ন্যায় ভিত্তিক বা যুক্তি ভিত্তিক নৈতিকতার আওতায় পরে। মানুষ মাত্রই বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন জীব বা মানুষ মাত্রই বৌদ্ধিক জীব– এই প্রকার পূর্বশর্ত অবলম্বন করে, ন্যায় ভিত্তিক নৈতিকতার পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে। এই প্রকার নৈতিকতার আবশ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ :-

১। মূলস্রোতের বুদ্ধিনিষ্ঠ নৈতিকতা পূর্ব নির্ধারিত এবং বাহ্যিকভাবে আরোপিত। এইরূপ নৈতিক ভাবনা যে সকল পূর্বতঃসিদ্ধ সার্বিক নীতি বা বিধির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সকল নীতি বা বিধিকে পরিস্থিতি নিরপেক্ষভাবে প্রয়োগ করা যায় বলে দাবী করা হয়। এক্ষেত্রে মনে করা হয়, নৈতিক কর্তাকে বিমূর্ত বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়ে বাস্তব পরিস্থিতি, স্থান-কাল প্রভৃতি নিরপেক্ষ, নৈর্ব্যক্তিক নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এইপ্রকার নৈতিকতায় সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা এবং নিয়মের সার্বিকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। মূলস্রোতের অধিকাংশ নীতিবিদরা নৈতিক বিচারকে এক প্রকার বৌদ্ধিক গণনারূপে (Rational Calculation) গণ্য করেন।

২। ন্যায়ভিত্তিক নৈতিকতা অনুসারে মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত পক্ষপাতহীন, বুদ্ধিসম্মত বিচার এবং সকল প্রকার আবেগযুক্ত আচরণ পরিহার।

৩। যুক্তিনিষ্ঠ নৈতিক ভাবনায়, নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অধিকার (Right), ন্যায্যতা (Justice), সুবিচার (Fairness) এবং বিষয়তা (Objectivity)–এর প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে এমন এক সূত্র দেওয়া হয় যা মূর্ত পরিস্থিতি থেকে দূরে সরে বিমূর্তীকরণের মাধ্যমে গঠিত। এইপ্রকার নীতি বা সূত্রের প্রয়োগের গন্ডীও পূর্ব নির্ধারিত এবং নির্দিষ্ট।

৪। মূলস্রোতের ন্যায়ভিত্তিক নৈতিকতা অনুসারে, ব্যক্তিসত্তার নির্মাণ সংজ্ঞায়িত হয় স্বতন্ত্র, স্বাধীনতা এবং স্বকীয়তার দ্বারা। এই ভাবনা অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তি যত বেশী বিচ্ছিন্নতার মাঝে গড়ে উঠবে, তত অধিক তার চিন্তন পদ্ধতিতে স্বাতন্ত্র্যতা পরিলক্ষিত হবে। স্বতন্ত্রতা (Autonomy) হল বৌদ্ধিক মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার একটি সদ্‌গুণ। এই গুণের দ্বারা সকল ব্যক্তি তার বুদ্ধি বা যুক্তিবোধের দ্বারা নির্ধারিত কতকগুলি সামান্য বা সাধারণ নীতির সাহায্যে যথার্থ নৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম। এই প্রকার নীতিগুলি কোন ভাবেই কার্য-কারণ বা ইন্দ্রিয়ের কামনা–বাসনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা প্রভাবিত হবে না। বিচ্ছিন্ন নৈতিক চিন্তনকে (Detached Moral Thinking) গ্রহণ করা হয় ধ্রুপদী নীতিতত্ত্বে। এক্ষেত্রে নৈতিক যোগ্যতা বা সক্ষমতার অর্থ হল– নিরপেক্ষ বৌদ্ধিক নির্বাচন করার সক্ষমতা।

ধ্রুপদী নীতিবিদ্যার আঙ্গিকে পক্ষপাতরাহিত্য- এই প্রসঙ্গে মূলত দুজন ধ্রুপদী নীতিদার্শনিকের মত সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে, তাঁরা হলেন– জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট এবং মার্কিন নীতিদার্শনিক জন রলস।

বুদ্ধিবাদী দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪) নৈতিক চিন্তনের ক্ষেত্রে পক্ষপাতরাহিত্যকে একটি অবশ্য পূরণীয় শর্তরূপে বিবেচনা করেছেন। কান্টীয় নৈতিক ভাবনার সার কথাই হল-সর্বদা কর্তব্যের জন্যই নিঃশর্ত কর্তব্য করা উচিত। তিনি নৈতিক কর্তব্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বার্থ, উপযোগিতা, ভাবাবেগ, প্রসঙ্গ প্রভৃতি ব্যতিরেকে একটি বিচার–ব্যবস্থা স্থাপনের মত দিয়েছেন। কান্ট সকল প্রকার নৈতিক বিধির উৎসরূপে বিশুদ্ধ বুদ্ধি বা বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাকে (Pure Reason) স্বীকার করেছেন। ফলত নৈতিকতার বিষয়ীরূপে কান্ট, বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মানুষের স্ব-অধিকারকেই মর্যাদা দিয়েছেন। প্রত্যেক ব্যক্তির বিশুদ্ধ ব্যবহারিক বুদ্ধিই হল তার নৈতিক কর্তব্য নির্ধারণের মূল উৎস। কান্টের দৃষ্টিতে নৈতিকতা হল বিশুদ্ধ

প্রায়োগিক বৌদ্ধিকতার আদেশ (dictates of pure practical reason)। নৈতিক জ্ঞান, বিচার তথা নৈতিক সিদ্ধান্ত বিষয়ক ভাবনাকে সামগ্রিকভাবে পক্ষপাতরহিতরূপে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে কান্ট, নৈতিকতার অবশ্য পূরণীয় শর্ত হিসেবে বৌদ্ধিকতাকেই বেছে নিয়েছেন। প্রতিটি মানুষের নিজস্ব ব্যবহারিক বুদ্ধি, তার নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মানদন্ড স্বরূপ এবং সেই বুদ্ধির বিশুদ্ধ অর্থাৎ অভিজ্ঞতা, আবেগ নিরপেক্ষ হওয়া আবশ্যক।

কান্টের মতে প্রত্যেকের প্রজ্ঞা এক হলেও ক্রিয়া ভেদে বুদ্ধির দুটি ভিন্ন প্রকার আছে। যথা-'তাত্ত্বিক বুদ্ধি' (Theoretical Reason) এবং অপরটি 'ব্যবহারিক বুদ্ধি' (Practical Reason)।[8] উক্ত ব্যবহারিক বুদ্ধির একটি বিশুদ্ধ রূপ আছে, আর এই বিশুদ্ধ ব্যবহারিক বুদ্ধিই হল নৈতিকতার উৎসস্থল। তিনি নৈতিকতার প্রসঙ্গে দুই ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন সত্তার উল্লেখ করেন। নিখুঁত বিশুদ্ধ ব্যবহারিক বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন সত্তা হল ঈশ্বর এবং বিশুদ্ধ ব্যবহারিক বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন সত্তা হল সাধারণ মানুষ। কান্ট নিখুঁত বিশুদ্ধ ব্যবহারিক বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন সত্তা বলতে সেই সত্তাকে বুঝিয়েছেন যার কোনরূপ ইন্দ্রিয়বৃত্তিজনিত কামনা-বাসনা নেই, আছে কেবল বিশুদ্ধ ব্যবহারিক বুদ্ধি (Pure Practical Reason)। এইরূপ সত্তার কোন প্রকার বিষয়ীনিষ্ঠ কর্মনীতি থাকে না, এঁরা শুধুমাত্র বিষয়নিষ্ঠ নৈতিক নিয়মের অধিকারী। কান্টের মতে একমাত্র ঈশ্বরই হলেন সেই নিখুঁত বিশুদ্ধ ব্যবহারিক বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন সত্তা, যিনি সকল প্রকার কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে। কোনরূপ ফল লাভের আকাঙ্ক্ষা তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

অপরদিকে বিশুদ্ধ ব্যবহারিক বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন সত্তা বলতে কান্ট সাধারণ মানুষকে বুঝিয়েছেন, কারণ তাদের প্রজ্ঞার পাশাপাশি ইন্দ্রিয়বৃত্তিজনিত কামনা, আকাঙ্ক্ষাও রয়েছে। এমতাবস্থায় একদিকে যেমন বিষয়ীগত বাসনাগুলি তাদের নৈতিক পদ থেকে বিচ্যুত করতে

---

[8] Sen, Pranab Kumar. "The Concept of Rationality." *Reference and Truth*, by Pranab Kumar Sen, ICPR in association with Allied Publishers Ltd., New Delhi, 1991, p. 201.

উদ্যত হয়, অপরদিকে আবার বুদ্ধি তাদের কাছে নৈতিক অনুশাসনের প্রতি শ্রদ্ধা, আনুগত্য দাবি করে। ফলস্বরূপ ব্যক্তির জীবনে বুদ্ধি এবং বাসনার দ্বন্দ্ব অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে থাকে। কান্ট মনে করেন এই দ্বন্দ্বের সামগ্রিকভাবে অবসান ঘটানো ব্যক্তির সাধ্যাতীত, তথাপি তার কর্তব্য হল- এই দ্বন্দ্ব নিরসনের প্রচেষ্টা অবিরাম চালিয়ে যাওয়া। ব্যক্তি অনুরাগ, ভাবাবেগ, স্নেহ, মোহ, উপযোগিতা, বিদ্বেষ প্রভৃতির বশবর্তী হয়ে আশা-আকাঙ্ক্ষার জগতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, কারণ সে সর্বদা প্রজ্ঞার দ্বারা চালিত হতে সমর্থ নয়। এই প্রসঙ্গে কান্ট ব্যাখ্যা করেন, মানুষ যত অধিক মাত্রায় নিজের ব্যবহারিক বুদ্ধির অনুশীলন করবে, ততই সে নৈতিকতার শীর্ষস্থানে উপনীত হতে পারবে। ব্যবহারিক বুদ্ধির অধিকতর চর্চার মধ্য দিয়েই ব্যক্তি তার সব রকম বিষয়গত আবেগ-আকাঙ্খার সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে, শুভবুদ্ধি প্রসূত 'সৎ-সংকল্প' (Good Will) দ্বারা পরিচালিত হতে সফল হবে। এরফলে তার নৈতিকতার পথ হয়ে উঠবে প্রশস্ত। কান্টের মতে আবেগ, স্নেহ, যত্ন, ভালোবাসা, দরদ, মর্মস্পর্শিতা প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিগুলি মানুষের কাজের অনুষঙ্গ হলেও সেগুলি যেন কখনো প্রধান পরিচালিকা শক্তিরূপে সক্রিয় না হয়ে ওঠে, সেই বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। অন্যথায় কাজটি নৈতিক ক্রিয়ারূপে পরিগণিত হবে না। কান্টের বক্তব্য অনুসারে, যখন ব্যক্তি তার সৎ-সংকল্প দ্বারা পরিচালিত হয়ে সমস্ত রকমের ফল লাভের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র কর্তব্য সাধনের উদ্দেশ্যেই কর্তব্য করে, তখনই সেই ক্রিয়ার নৈতিক মূল্য স্বীকৃত হয়। তিনি মনে করেন জগতে এবং জগতের বাইরেও সৎ-সংকল্প ব্যতীত অপর কিছু নিঃশর্ত-শুভ হয় না। কান্টের পরিভাষায়-

> "The only thing that is good without qualification or restriction is a good will. That is to say, a good will alone is good in all circumstances and in that sense is an absolute or unconditioned

good. We may also describe it as the only thing that is good in itself, good independently of its relation to other things."[৫]

কান্টের বক্তব্য অনুসারে এই সৎ-সংকল্প কোনরূপ ফল লাভের আকাঙ্ক্ষা ছাড়াই ব্যক্তিকে কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ করে। তিনি মনে করেন এই সৎ-সংকল্প বা ইচ্ছা নিজ মূল্যে মূল্যবান। এইক্ষেত্রে যদি অন্য কোন গুণাবলী বা প্রেক্ষিত যুক্ত নাও থাকে, তবু এই সৎ-সংকল্প স্বতঃমূল্যবানরূপে স্বীয়প্রভায় উজ্জ্বল হয়ে থাকে। কর্তব্য সাধনের ক্ষেত্রে কান্ট মূলত দুই ধরনের নৈতিক আদেশ বা অনুজ্ঞার উল্লেখ করেন। কান্টীয় পরিভাষায় একটি হল- 'শর্ত-সাপেক্ষ অনুজ্ঞা' এবং অপরটি হল- 'শর্ত-নিরপেক্ষ অনুজ্ঞা'। তাঁর মতে,

"All imperatives command either hypothetically or categorically. Hypothetical imperatives declare a possible action to be practically necessary as a means to the attainment of something else that one wills (or that one may will). A categorical imperative would be one which represented an action as objectively necessary in itself apart from its relation to a further end."[৬]

কান্টের মতানুসারে, শর্তাধীন অনুজ্ঞার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ব্যক্তির কৃত কর্মটি সর্বদাই কোন না কোন বিষয়ীগত অভিষ্ঠ সিদ্ধির পরিকল্পনা যুক্ত হয়। এই ধরনের শর্ত-সাপেক্ষ অনুজ্ঞা সর্বদা কোন উদ্দেশ্য অভিমুখী কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়। অপরপক্ষে, শর্ত-নিরপেক্ষ

---

[৫] Kant, Immanuel. *Groundwork of the Metaphysic of Morals*, Trans. By H.J. Paton, as *The Moral Law*, Hutchinson and Co (Publishers) Ltd., London, 1976, p.17.

[৬] Kant, Immanuel.1976, p. 78.

আদেশ পালনের ক্ষেত্রে কোন উদ্দেশ্য লাভের বিষয় যুক্ত থাকে না। এইপ্রকার অনুজ্ঞা মানুষের উপর শর্তহীনভাবে আরোপিত হয়। শর্ত-সাপেক্ষ অনুজ্ঞা ক্ষেত্র বিশেষে উপযোগি হলেও, শর্ত-নিরপেক্ষ অনুজ্ঞাকেই কান্ট তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠ নৈতিকতার চূড়ান্ত মাপকাঠিরূপে নির্ধারিত করেছেন। কান্ট কর্তব্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এক প্রকার নিঃশর্ত অনুজ্ঞা বা নিঃশর্ত আদেশের কথা উল্লেখ করেন। উল্লেখিত এই নিঃশর্ত অনুজ্ঞা বা নির্দেশ 'Categorical Imperative' নামে পরিচিত, যা একমাত্র নৈতিক বিধিরূপে চিহ্নিত। কান্টের ভাষায় এটি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হলেও, তাদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য বিবরণ নিম্নরূপ–

> "Act only on that maxim through which you can at the same time will that it should become a universal law".[৭]

কান্ট বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মানুষকেই নৈতিক কর্তারূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁর নৈতিক ভাবনায় নিঃশর্ত অনুজ্ঞাকে প্রতিস্থাপন করার মাধ্যমেই তিনি অনপেক্ষতা, বিষয়তা, সার্বজনীনতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি উপস্থাপন করেন। কান্ট আবেগ, স্নেহ, ভালোবাসা, দরদ প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিগুলিকে অস্বীকার না করলেও নৈতিকতার প্রেক্ষাপটে এদের গুরুত্ব স্বীকার করেননি।

মার্কিন আইনবিদ তথা রাজনৈতিক দার্শনিক জন রলসের (১৯২১-২০০২) মতানুসারে, ন্যায়নিষ্ঠ হওয়ার একমাত্র উপায় হল যুক্তিপরায়ণতা।[৮] রলস যে আদর্শ নৈতিক সমাজের কথা বলেছেন সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তির সমান অধিকার থাকা বাঞ্চনীয়। আর মানুষ হল বৌদ্ধিকতার সর্বাধিকীকরণকারী (Rationality Maximizer)।[৯] রলস ন্যায্যতার মানদণ্ডরূপে এই

---

[৭] Kant, Immanuel.1976, p. 84.

[৮] Rawls, John. *The Theory of Justice*, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1971.

[৯] মৈত্র, শেফালী, ২০০৩, পৃ. ১৩০।

সর্বাধিকীকরণের নীতিটির উল্লেখ করেছেন। সামাজিক ব্যবস্থার ন্যায্য পরিকল্পনা বিষয়ক নীতি বাস্তবে ব্যক্তির অধিকার ও কর্তব্যের নীতি, যা অনুসরণ করলে সর্বনিম্ন দুর্দশাগ্রস্থ ব্যক্তির অবস্থানকেও সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়। অর্থনীতির দিক থেকে দেখলে রলসের নীতি এমন এক ন্যায্য মৌলিক কাঠামো গড়ে তোলার চেষ্টা করে, যার সাহায্যে সব থেকে কম সুবিধাভোগী ব্যক্তিরও সবচেয়ে অধিক সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা প্রশস্ত হয়।

নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ধারণাটি ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৭৬) তাঁর "judicious spectator"-এর ব্যাখ্যায় তুলে ধরেছেন, যেখানে ব্যক্তি নিজেদের স্বার্থ ও পছন্দ থেকে কল্পনায় বিমূর্তীকরণের মাধ্যমে এক নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করে এবং সেই পক্ষপাতশূন্য অবস্থান থেকে নিজের ও অপরাপর ব্যক্তিদের কাজের প্রভাব কিভাবে সর্বজনের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে পারে তা বিচার করে। এমন এক নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা যেকোন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব বলে হিউম দাবি করেন।[১০]

যুগে যুগে দার্শনিকগণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিকে নৈতিক বিধি ও নীতির বৈধকরণ প্রক্রিয়ার ভিত্তিরূপে বর্ণনা করেছেন। রলস ন্যায্যতার প্রসঙ্গে এই নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্বকে স্বীকার করেছেন। তিনি মনে করেন, ব্যক্তি মাত্রই আত্মকেন্দ্রিক। ফলে একটি আদর্শ সমাজব্যবস্থায় ন্যায়নীতি স্থাপনের প্রসঙ্গে তাকে কতকগুলি চুক্তির আশ্রয় নিতে হয়। যথার্থ নৈতিক পরিকাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে হলে ব্যক্তিকে আত্মকেন্দ্রিক এবং পরস্পরের প্রতি একপেশে প্রতিযোগী মনোভাব ত্যাগ করার প্রতি চুক্তিবদ্ধ হতে হবে। তিনি বলেন যে, ব্যক্তির সাথে অপর ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক দুই ধরনের হতে পারে। এক, সেই সম্পর্ক হতে হবে চুক্তিভিত্তিক, অথবা সেই সম্পর্ককে হতে হবে উচ্চ-অনুচ্চ বা হাইয়ারারকিকাল। রলসের ভাবনায়, কোন

---

[১০] Hume, David. *A Treatise of Human Nature*, (Book III, part 3, Section I), reprinted Oxford University Press, 2nd. Edition, 1739 (1978), p. 581.

কর্মপন্থাকে যদি নৈতিকতার মর্যাদা দিতে হয় তবে তাকে একটি নির্দিষ্ট নীতি বা চুক্তির আকারে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।[১১] এই চুক্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দুটি বিষয় মাথায় রাখা জরুরী। প্রথমত- সমাজে কীভাবে ভোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় তা বিচার করা। দ্বিতীয়ত- সেই উৎপাদিত ভোগ্য পণ্যের উপভোগের ক্ষেত্রে সমবন্টন হচ্ছে কীনা, অর্থাৎ ন্যায্যতার নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে কীনা সেই বিষয়েও লক্ষ্য রাখতে হবে। রলস নৈর্ব্যক্তিক নৈতিকতা এবং ব্যক্তির স্বার্থসিদ্ধির মধ্যে একটি সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্ঠা করেছেন এই চুক্তি স্থাপনের মাধ্যমে। তিনি আদর্শ সামাজিক পরিকাঠামো গঠনের ক্ষেত্রে দুটি পূর্বশর্ত স্বীকার করে নেন। এক- প্রতিটি মানুষকে হতে হবে বৌদ্ধিক এবং যুক্তিপরায়ণ। দুই- ব্যক্তির সম্পর্কগুলি হবে চুক্তিসাপেক্ষ। রলস যথার্থ নৈতিকতার মানদন্ড নির্ধারণের ক্ষেত্রে দুটি মৌলিক সূত্র বা ভিন্ন নীতির অবতারণা করেন।

প্রথম নীতি অনুসারে, সমমানের মৌলিক স্বাধীনতার (equal basic liberty) পূর্ণ এবং পর্যাপ্ত ব্যবস্থার প্রতি সকল ব্যক্তির সমান ও স্থায়ী দাবী থাকা আবশ্যক। রলস তাঁর ন্যায়তত্ত্বে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। দ্বিতীয় নীতি অনুসারে, সমাজের উদ্ বৃত্তকে এমনভাবে বন্টন করতে হবে যাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক অসাম্যকে দূর করে সকলের মঙ্গল সাধন করা সম্ভবপর হয়। এছাড়াও যেসকল পদ অসম সুবিধা প্রদান করে, সেই সকল পদ অর্জন করার প্রতিযোগিতাকে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির অংশগ্রহণের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে। এই দুই প্রকার নীতির সাহায্যেই একটি যথার্থ সামাজিক পরিকাঠামো নির্ধারণ করা সম্ভব হবে। উক্ত নীতিগুলির নির্ধারণ প্রসঙ্গে বৌদ্ধিকতা আবশ্যিক। বৌদ্ধিক এবং যৌক্তিক মানুষ উক্ত প্রকার নীতি অনুসরণ করে, সম্পূর্ণরূপে পক্ষপাতরহিত, বিমূর্ত নৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম।

---

[১১] মৈত্র, শেফালী, ২০০৩, পৃ. ১৩১।

রলস বলেছেন ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে এই ভিন্ন নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে। তিনি যৌক্তিক ন্যায়নীতির সাহায্যে এমন একটি সামাজিক পরিকাঠামো নির্মাণে উদ্যোগী হন, যেখানে সকল বৌদ্ধিক এবং স্বাধীন মানুষেরা নিজেদের সার্বিক উন্নতি সাধন করতে সমর্থ হবে। সমাজের সকল মানুষের সমান প্রাথমিক বা মৌলিক অধিকার ধার্য করা হবে এবং সামাজিক উদ্‌বৃত্তের ন্যায্য বন্টন করা হবে। এক্ষেত্রে কোনটি ন্যায্য এবং কোনটি অন্যায্য সেটি পূর্ব থেকেই নির্ধারিত থাকবে। আর এই যথার্থ নির্ধারণের জন্য প্রয়োজন বৌদ্ধিক এবং যৌক্তিক চিন্তনের দ্যোতনা। আদর্শ সমাজের যথার্থ নৈতিক পরিকাঠামো স্থির করার ক্ষেত্রে আবেগ, প্রত্যয়, সাপেক্ষ ভাবনাকে ত্যাগ করে, পক্ষপাতশূন্য অবস্থান অবলম্বন করতে হবে। রলস নৈতিকতার মুখ্য উদ্দেশ্যরূপে উল্লেখ করেছেন, সমাজের অন্তর্ভুক্ত প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা মানুষের মৌলিক অধিকার নির্ণয় করা এবং সামাজিক দায়িত্ব বন্টন যথার্থ রূপে করা হচ্ছে কীনা তা পর্যবেক্ষণ করা।

প্রতিটি ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান ভিন্ন। স্বভাবতই তাদের প্রত্যেকের প্রত্যাশাও ভিন্ন। এবারে প্রশ্ন হল, সমাজে এতপ্রকার ভিন্নতা সত্ত্বেও কীভাবে নির্দিষ্ট, নিরপেক্ষ নীতি নির্ধারণ করা হবে। রলস এই নীতিগুলিকে পক্ষপাত মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে, একপ্রকার অজ্ঞতার আবরণ (Viel of Ignorance) এর উল্লেখ করেন, যার সাহায্যে প্রত্যেক ব্যক্তি সকল প্রকার সাপেক্ষতা, প্রাসঙ্গিকতা ছাপিয়ে যেতে সমর্থ হবে। এর মাধ্যমে প্রত্যেক নৈতিক কর্তা নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থান, শ্রেণী, যোগ্যতা, শুভ-অশুভের ধারণা, মানসিক প্রবৃত্তি প্রভৃতি সকল প্রকার ব্যক্তিনিষ্ঠ বিষয়কে আবরিত করে রাখবে এবং সকল প্রকার মূর্ত চিন্তন, সাপেক্ষ ভাবাবেগের ঊর্ধ্বে গিয়ে প্রেক্ষিত নিরপেক্ষ, বিমূর্ত যথার্থ নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। সুতরাং নৈতিক কর্তার আদি অবস্থানটি (Original Position) হবে

নিরপেক্ষ, পক্ষপাতমুক্ত।[১২] রলস-এর মতে, এই প্রকার নৈতিক সামাজিক ব্যবস্থায় প্রত্যেক সদস্যই সম পরিমাণে সুবিধাভোগ করবে। সমাজের কোন মানুষ যেন তার মৌলিক প্রয়োজন বা চাহিদা পূরণ থেকে বঞ্চিত না হয় এবং দারিদ্র সীমার নিম্নে অবস্থান না করে, সেই জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি মৌলিক চাহিদাগুলি সকলের ক্ষেত্রে সমান ও প্রাথমিকভাবে পূরণ করতে হবে। এবারে, সমাজের প্রত্যেক সদস্যের প্রাথমিক, মৌলিক চাহিদা মেটানোর পর, যা কিছু উদ্বৃত্ত সম্পদ থাকবে, তার ন্যায্য বন্টন হবে। কিন্তু এই উদ্বৃত্তের বন্টনের ক্ষেত্রে তিনি প্রতিযোগিতার প্রয়োজন উল্লেখ করেন। এক্ষেত্রে সমাজে এক প্রকার উচ্চ-নীচ স্তরায়ন (hierarchy) থাকবে। রলস সামাজিক উদ্বৃত্তের অসম বন্টন ব্যবস্থা করেছেন কারণ তিনি মনে করেছেন, এর মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা বজায় থাকবে এবং তারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে ক্রমশ পারদর্শি হয়ে উঠবে। বৌদ্ধিকতা এবং যুক্তিকে রলস তাঁর তত্ত্বে এমনভাবে শীর্ষস্থান দিয়েছেন যেন যা কিছু যৌক্তিক নয় তাই তাঁর কাছে অনৈতিক।

এই অধ্যায়ে মূলস্রোতের বুদ্ধিবাদী ঘরানার দুই দার্শনিকের মত অবলম্বন করে আমরা যে আলোচনা করেছি তার ভিত্তিতে নীতিদর্শনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হয়েছে। ধ্রুপদী নীতিশাস্ত্রে একটি অনন্য আদর্শ, মানদণ্ড বা তন্ত্র দ্বারা সকল নৈতিক সমস্যার সমাধান পাওয়ার অঙ্গীকার করা হয়। মানুষের যেমন বুদ্ধি, যুক্তি, বিচার ও মননের সামর্থ্য আছে, ঠিক তেমনি জীবন যাপনের অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, আবেগ প্রভৃতি আছে। তথাপি সেই সকল অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তি সাপেক্ষ আবেগীয় উপাদানগুলি মূলস্রোতের তন্ত্রে অদৃশ্য থেকেছে, কারণ সেখানে নৈতিক সিদ্ধান্ত ও বিচারের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা ছাড়া বাকি সব বিষয় বাদ পড়েছে। চিরায়ত নৈতিকতার আবশ্যিক শর্ত হল পক্ষপাতরাহিত্য, যা বিষয়তা, নৈর্ব্যক্তিকতা ও

---

[১২] Rawls, John. 1971, p. 190.

সার্বজনীনতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। বৌদ্ধিকতা এই সদগুনের উৎস বলে গৃহীত হওয়ায় বুদ্ধি ও আবেগ, পক্ষপাতরাহিত্য ও পক্ষপাত-সাপেক্ষতা, সার্বজনীনতা ও বিশেষ সম্বন্ধীয়তা, বিচ্ছিন্নতা ও সংযুক্ততা বা সম্পর্কিত থাকা- প্রভৃতি প্রতিটি দিকোটিক বিভাজনে একপ্রকার উচ্চ-নীচ স্তরায়ন পরিলক্ষিত হয়। নীতিশাস্ত্রে যুক্তি, বুদ্ধি ও আকার সর্বস্ব বিধির প্রাধান্যের ফলে বহিরঙ্গ (লৌকিক) ও অন্তরঙ্গ (ব্যক্তিগত) সম্পর্কের জগতের মধ্যে এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর সৃষ্টি হয়। পরবর্তী সময়ে অনেক দার্শনিক ধ্রুপদী নৈর্ব্যক্তিক, নিরপেক্ষ নৈতিক বিচারের ধারণাটিকে সমালোচনা করেছেন এবং নীতিশাস্ত্রের প্রেক্ষিতে পরিবর্তনের প্রয়োজন উপলব্ধি করেছেন। ১৯৬০-এর দশকে নারীবাদী দার্শনিকগণ নীতিশাস্ত্রে বৌদ্ধিকতা, সার্বজনীনতা ও পক্ষপাতরাহিত্যের প্রাধান্যকে চ্যালেঞ্জ করেছেন এবং নীতিশাস্ত্রের অভিমুখ ব্যক্তি-প্রতিরূপের দিকে হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। পরবর্তী অধ্যায়ে নারীবাদী দর্শনের আঙ্গিকে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নারীবাদী দর্শন অনুসারে পক্ষপাতরাহিত্য

ধ্রুপদী নীতিবিদ্যায় পক্ষপাতরাহিত্য যেরূপে চিত্রায়িত হয়েছে, তার বিরুদ্ধে নারীবাদী দার্শনিক অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন বারংবার। এই বিষয়ে নারীবাদী নীতিবিদগণের অভিমত ও সমালোচনা প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনার পূর্বে, নারীবাদের স্বরূপ এবং নীতিবীক্ষা বিষয়ক তাঁদের মূল বক্তব্যগুলির স্ববিস্তার ব্যাখ্যা প্রয়োজনীয় এবং প্রাসঙ্গিক।

নারীবাদের স্বরূপ :

নারী ও পুরুষের মধ্যে কিছু জৈবিক পার্থক্য বর্তমান, পারিভাষিকভাবে যাকে বলা হয় যৌনভেদ (Sex difference)। কিন্তু সমাজ দ্বারা সৃজিত নারী-পুরুষের যে প্রভেদ তাকে বলা হয় লিঙ্গপ্রভেদ (Gender difference)। আমাদের সমাজ নিজ প্রত্যাশা পূরণের স্বার্থে যৌনভেদকে, লিঙ্গপ্রভেদের আকার প্রদান করে বৈষম্যের সৃষ্টি করেছে। প্রত্যেক সমাজই আদর্শ নারী ও পুরুষের ধারণা অনুসারে, তাদের যোগ্য গুণাবলী এবং আচরণ নির্ধারণ করে। সাধারণত অধিকাংশ সমাজে পুরুষকে দৃঢ়, সাহসী, আক্রমণাত্মক প্রভৃতি গুণের অধিকারীরূপে উপস্থাপন করা হয়। অপরদিকে নারীকে চিহ্নিত করা হয় ত্যাগ, মমত্ব, যত্নপরায়ণতা, বিনয় প্রভৃতি গুণের অধিকারীরূপে। নারী ও পুরুষের কাছ থেকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার প্রত্যাশা করে, তাদের ওপর পৃথক পৃথক লিঙ্গ-ধর্ম আরোপ করা হয়। নারী ও পুরুষের যৌনপার্থক্যের উপর ভিত্তি করে, সমাজে যে লিঙ্গ-পার্থক্যের নির্মাণ করা হয়, সেটির ভিত্তিতে নারী ও পুরুষের নির্দিষ্ট মূল্য নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে একপ্রকার বৈষম্যের আবির্ভাব পরিলক্ষিত হয়। এরূপ বৈষম্যের ফলস্বরূপ পুরুষের গুণাবলীগুলিকে সর্বদা অধিক মূল্যের অধিকারীরূপে এবং নারীর গুণাবলীগুলিকে, পুরুষের অপেক্ষা দুর্বলরূপে প্রতিপন্ন করা হয়। সুতরাং বলাবাহুল্য, সমাজ

দ্বারা সৃজিত এইরূপ বৈষম্যের শিকার হয় নারী। অতএব মানুষের যৌন পরিচয় জৈবিকভাবে নির্ধারিত হওয়া সত্ত্বেও নারী-পুরুষের নির্দিষ্ট লিঙ্গ-পরিচয় সামাজিকভাবে নির্ধারিত হয়ে থাকে। Ann Oakely-এর মতে,

> "Gender is a matter of culture, it refers to the social classification of men and women into 'masculine' and 'feminine'."[১]

কমলা ভাসীন, তাঁর *Understanding Gender* গ্রন্থে বলেছেন- যৌন-পরিচয় (Sex Identity) একটি প্রাকৃতিক বিষয়। অপরদিকে লিঙ্গ-পরিচয় (Gender Identity) হল সমাজ, সংস্কৃতি এবং ব্যক্তি নির্মিত।[২]

নারী মৃত্তিকার ন্যায় উৎপাদনশীলা। সন্তান উৎপাদনের সক্ষমতা থাকায় প্রাগৈতিহাসিক যুগ ধরে সমাজ নারীর উপরেই সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব অর্পণ করে এসেছে। কৃষিকেন্দ্রিক সভ্যতার প্রারম্ভকাল থেকেই, নারীর কর্ম জীবনকে আবদ্ধ করা হয়েছে পরিবারের গণ্ডির মধ্যে। ক্রমান্বয়ে তার অবস্থান গৃহকর্মের সংকীর্ণতায় রুদ্ধ হয়েছে। নারী এবং পুরুষকে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থান প্রদান করার মাধ্যমেই, বাস্তবত বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছে। পুরুষ স্থান পেয়েছে সমাজের কেন্দ্রে, অপরদিকে নারীর অবস্থান প্রান্তিকরূপে ধার্য করা হয়েছে। এই কেন্দ্রবাসী পুরুষ, নারী তথা প্রান্তিক মানুষদের অস্তিত্ব-অবস্থানকে অবজ্ঞা ও অবহেলা করে এসেছে। সুতরাং প্রান্তিক মানুষগুলি ক্রমে অবদমিত, অদৃশ্য এবং বঞ্চিত হয়েছে। নারীর উপর পুরুষের আধিপত্য ও নারীকে বশ্যতার অধীনে রাখার যে প্রয়াস, তারই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বা রূপ হল 'পিতৃতন্ত্র'। এই পিতৃতন্ত্র কোনও একটি নির্দিষ্ট মতাদর্শ বা প্রক্রিয়া নয়। এটি

---

[১] Bhasin, Kamla. *Understanding Gender*, New Delhi: Women Unlimited, 2000, p. 2.

[২] Bhasin, Kamla. 2000, p. 3.

এমন একটি লিঙ্গ-ভিত্তিক জীবনের ক্রম যেখানে পুরুষ সমাজের শীর্ষাসনে অবস্থিত। উচ্চ-নীচ স্তরায়ন এবং লিঙ্গ-সংক্রান্ত দ্বিকোটিক বিভাজনের দ্বারাই পিতৃতন্ত্র নির্মিত। এই তন্ত্রে ক্ষমতার দুটি বিপরীত কোটি কল্পনা করা হয়। কেন্দ্র ও প্রান্তের দুটি স্পষ্ট কোটি বর্তমান। কেন্দ্রের প্রেক্ষিতটি উত্তম, যথার্থ আর প্রান্তের প্রেক্ষিতটি অধম এবং অযথার্থ। পিতৃতন্ত্র একটি ক্রমোচ্চ স্তরায়ন বিশিষ্ট বিশেষ ব্যবস্থা, যা মূলত সমাজের পুরুষ-প্রধান বা পরিবারে পিতার নিয়ম দ্বারা পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত। এই তন্ত্রে পুরুষের সমস্ত বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলীকে মানব বৈশিষ্ট্যরূপে চিহ্নিত করে, নারীসুলভ বৈশিষ্ট্যের উপরে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপ ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তরে, ভিন্ন পর্যায়ে, লিঙ্গপ্রভেদ সৃষ্টি করে নারীর উপর পুরুষের আধিপত্য কায়েম করা হয়ে এসেছে।[৩] পিতৃতন্ত্র দ্বারা সৃজিত এইপ্রকার লিঙ্গ-বৈষম্যকে নারীবাদী তীব্রভাবে তিরস্কার করেন। তাঁরা মনে করেন পুরুষ নিয়ন্ত্রিত সমাজ, নারী ও পুরুষের থেকে পৃথক পৃথক আদর্শ ও আচরণ প্রত্যাশা করার মাধ্যমে, এই লিঙ্গপ্রভেদ সৃষ্টি করে। পুরুষের থেকে সমাজ দ্বারা প্রত্যাশিত হয়, দৃঢ়তা, সাহস, তেজ, নেতৃত্ব, বীরত্ব প্রভৃতি। অপরদিকে আদর্শ নারীর মর্যাদা লাভ করতে নারীকে হতে হয় কোমল হৃদয়া, নমনীয়, সহনশীল এবং আত্মত্যাগী। নারী ও পুরুষের (নারীসুলভ ও পুরুষসুলভ) ধর্মগুলি ভিন্ন হওয়ার পাশাপাশি, সমাজে তাদের ব্যক্তি সত্তার মূল্যও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক পরিকাঠামোয় পুরুষ অবস্থান করে কেন্দ্রে, আর নারীর ঠাঁই হয় প্রান্তে। কেন্দ্রে অবস্থিত পুরুষের আধিপত্য কায়েম হয়, অপরদিকে প্রান্তিক অবস্থানে থাকা নারীর স্বর সমাজে অবহেলিত, বঞ্চিত ও রুদ্ধ হয়। পিতৃতন্ত্র নারী সত্তার অবদমন এবং অবমূল্যায়ন করে তার ভাষাকে অশ্রুত করেছে বারংবার। এক্ষেত্রে নারীর নীরবতা প্রশংসিত হয়েছে। কতগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা ধর্মকে নারীসুলভ বলে নির্দিষ্ট করে, সেগুলিকে মানব-ধর্ম থেকে পৃথকরূপে প্রতিপন্ন

[৩] ভাসীন, কমলা, *পিতৃতন্ত্র কাকে বলে?* স্ত্রী, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ১।

করা হয়েছে। এইভাবেই পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর সত্তা তথা মূল্যবোধ অবহেলিত হয়ে এসেছে।[8]

নারীবাদ হল পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর এইপ্রকার অবদমিত অবস্থান সম্পর্কে, মানব জাতিকে সচেতন করার একটি প্রয়াস। আপাতদৃষ্টিতে অনেকে মনে করেন, পিতৃতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে মাতৃতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করাই হল নারীবাদের মূল উদ্দেশ্য। পুরুষ প্রাধান্যের পরিবর্তে, নারীর প্রাধান্য স্থাপন করাই বোধহয় নারীবাদের আকাঙ্ক্ষা- এই ধারণাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। নারীবাদের যথার্থ লক্ষ্য হল, সমাজে ব্যক্তি সত্তার স্বমূল্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে লিঙ্গ-বৈষম্যের অবসান ঘটানো। নারীবাদের আদর্শকে অবলম্বন করে, নারী তথা সমাজের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত, অবহেলিত, পীড়িত, অবদমিত ও প্রান্তিক মানুষের উত্তরণ ঘটাতে নারীবাদীরা প্রচেষ্ট। নারীবাদের বিবিধ বক্তব্যগুলির মধ্যে, এই গবেষণা প্রবন্ধে মূলত যেদিকে আলোকপাত করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে, তা হল নীতিদর্শনের ক্ষেত্রে নারীবাদী অবস্থান কিরূপ।

নারীবাদী নীতিদর্শন-- নারীবাদী নীতিবিদ্যা, একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মূলস্রোতের তত্ত্বগুলির সমালোচনা করে এবং তাদের সংশোধন তথা পুনর্গঠন করতে উদ্যোগী হয়। বিংশ শতাব্দীর আশির দশক থেকে, মূলস্রোতের দর্শনের একাধিক প্রতিষ্ঠিত ধারণাকে নারীবাদীরা লিঙ্গপ্রেক্ষিতে বিচার করতে শুরু করেন। তাঁরা মনে করেন, ধ্রুপদী নৈতিকতার আদর্শগুলি নারীর নৈতিক সামর্থ্যের অবমূল্যায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং এই আদর্শগুলির গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে বিচারমূলক আলোচনা প্রয়োজন। ধ্রুপদী নীতিদর্শনে নারী তথা নারীর নৈতিক ভাবনাকে নানাভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে। নৈতিকতার প্রেক্ষাপটে কিভাবে

---

[8] Gilligan, Carol. “Looking Back to Look Forward: Revisiting In a Different Voice.” *Joining the Resistance*, Cambridge, Mass., Polity Press, 2011, pp. 14-43.

নারীর নৈতিক মননের উপর মূলস্রোতের নীতিদর্শন পুংকেন্দ্রিকতা প্রতিষ্ঠা করেছে, সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন নারীবাদী নীতি-তাত্ত্বিকগণ।

মূলস্রোতের নৈতিকতায় আবেগ তথা মূর্ত চিন্তনকে অগ্রাহ্য করে, নৈতিক যৌক্তিকতা এবং বিমূর্তীকরণকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই বিমূর্তীকরণ এবং নিরপেক্ষতার প্রভাবেই নারী সম্পর্কীয় আলোচনা মূলস্রোতের পরিধি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। নারীবাদীরা দাবি করেন নিরপেক্ষ মানবতার আড়ালে নারীর যাপন-অভিজ্ঞতা, নৈতিক মনন এবং তার জীবন বিষয়ক নৈতিক সমস্যাগুলিকে ধ্রুপদী নীতিদর্শন অবহেলা এবং অবজ্ঞা করেছে। পুরুষালী আদর্শ, নৈতিক-বোধ, মানদণ্ড, চিন্তন প্রভৃতি বিষয়গুলি নামান্তরে, নিরপেক্ষ মানব-আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে মূলস্রোতের তাত্ত্বিক দর্শনে।

ধ্রুপদী নৈতিকতায় পক্ষপাতরাহিত্যের আদর্শকে যেভাবে যথার্থ নৈতিক মননের মানদন্ডরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন নারীবাদী নীতিতাত্ত্বিকরা সোচ্চার হয়েছেন। মূলস্রোত দ্বারা প্রস্তাবিত নিরপেক্ষতা আদপে পুরুষ-পক্ষপাতের নামান্তর। নৈতিকতার প্রেক্ষিতে আমরা বিভিন্ন প্রকারের নারীবাদী মতবাদ পেয়ে থাকি। নিছক পরিবর্তন আনা বা সংস্কার করার উদ্দেশ্যে নারীবাদী বিকল্পের খোঁজ করেছেন তা নয়। এই বিকল্প নৈতিক পরিকাঠামো অনুসন্ধানের তাগিদ তাঁরা আন্তরিকভাবে অনুভব করেন। নারীবাদের বিকল্প প্রস্তাবগুলি একটি মূল সুরের গ্রন্থিতে বাঁধা। এক্ষেত্রে প্রতিটি বিকল্প নৈতিক অবস্থানের লক্ষ্য হল ক্ষমতার মেরুকরণকে প্রশ্রয় না দেওয়া। চর্যায় লিঙ্গ-সাম্য আনতে হলে, সেই চর্যা নিয়ামক চিন্তাতন্ত্রে বদল আনতে হবে। স্বার্থপরতা এবং ক্ষমতার আস্ফালন বৈষম্যের জন্য দায়ী। নীতিবিদ্যায় নারীর মনন শক্তির অবমাননার অবসান ঘটানোর স্বার্থে, নারীবাদীরা যে যে বিকল্প নীতিশাস্ত্রের উল্লেখ করেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হল দরদী নীতিবিদ্যা। এইপ্রকার বিকল্প নীতিশাস্ত্র নির্মাণের মাধ্যমে নারীবাদীরা, ধ্রুপদী নীতিশাস্ত্রের নানাবিধ সীমাবদ্ধতার প্রতি মানুষের

দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। নারীবাদীরা মনে করেন মানুষ সম্পর্কের বাঁধনে আবদ্ধ, সে কখনোই বিচ্ছিন্ন হয়ে অবস্থান করতে পারে না। তাঁরা মনে করেন, বাস্তব জীবনের বিবিধ অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন কখনোই নিরপেক্ষতা, সার্বজনীনতা, বিমূর্ততা প্রভৃতির মাধ্যমে সম্ভবপর নয়। তাই তাত্ত্বিক স্তরে সাপেক্ষতা, মূর্ততা, নির্দিষ্টতা, সম্পর্কিত থাকা, আবেগপ্রবণতার গুরুত্বকে মর্যাদা দেওয়া জরুরী। মূলস্রোতের নৈতিকতায় এই বিমূর্তীকরণ পন্থার সাহায্যে যে নিরপেক্ষ, সার্বজনীন সত্যে পৌঁছানোর কথা বলা হয় তার দ্বারা সমাজের একটি বড় অংশ, যথা- নারী, শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধীদের সুখ-দুঃখ এবং অভিজ্ঞতার অপসারণ ঘটে। সমাজে তাদের প্রান্তিকরূপে চিহ্নিত করে, তাদের অভিজ্ঞতার অবমনন করা হয় এবং তাদের ভিন্ন স্বর অশ্রুতই থেকে যায়। আর এই না শোনা ভিন্ন স্বরকে শোনার কথাই বলে, নারীবাদী দর্শনের একটি অন্যতম শাখা দরদী নীতিবিদ্যা। এই দরদী নীতিবিদদের মধ্যে যাঁরা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন- **ক্যারল গিলিগান** এবং **নেল নডীংস্‌**। এছাড়াও **ভার্জিনিয়া হেল্ড, সারা রুডিক, ইভা ফিডার কিটে** প্রমুখরা উল্লেখযোগ্য। দরদী নীতিবীক্ষায় নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিসাপেক্ষ ভাবনা ও পরিস্থিতি-সাপেক্ষতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এইপ্রকার নৈতিকতায় পক্ষপাতরাহিত্য এবং সার্বজনীনতার স্থান নেই। দরদী নৈতিকতায় যে নৈতিক স্বরের কথা উল্লেখ করা হয় সেই স্বর সম্পর্কিত সত্তার কথা বলে। নৈতিক পরিকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে পক্ষপাতরাহিত্যের পরিবর্তে পরিস্থিতি-সাপেক্ষতা এবং ব্যক্তির যাপিত অভিজ্ঞতার গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হয় দরদী নীতিশাস্ত্র।

নৈতিক মনস্তত্ত্ববিদ ক্যারল গিলিগান নারীবাদী নীতিশাস্ত্রের দিকপালরূপে অগ্রগন্যা। তিনি অভিজ্ঞতা ও প্রসঙ্গের উপর নির্ভর করে, নৈতিকতা এবং লিঙ্গ-ধারণার মেলবন্ধন ঘটাতে উদ্যত হয়েছেন। গিলিগান চিরায়ত নৈতিকতায় নারী সংক্রান্ত চিন্তন, ভাবনার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করেন এবং এমন এক বিকল্প নৈতিকতা নির্মাণের কথা বলেন যেখানে নারীর যাপিত

অভিজ্ঞতার নিরিখে, দরদের মাধ্যমে সম্পর্কিত ব্যক্তি-সত্তা নির্মাণের কথা বলা হবে। এই নৈতিকতায় সম্পর্কস্থিত দরদের প্রসঙ্গকে গুরুত্ব দেওয়া হয় বলেই এটি দরদী নীতিশাস্ত্ররূপে নামাঙ্কিত হয়েছে। গিলিগান মনে করেন, ধ্রুপদী নৈতিক তত্ত্ব-কাঠামো স্পষ্টতই লিঙ্গ-পক্ষপাতদুষ্ট এবং পিতৃতন্ত্রের মদতপুষ্ট। তিনি মূলস্রোতের ন্যায়নিষ্ঠ নৈতিকতার সমস্যাগুলি পর্যালোচনা করেন। তিনি এখানে বলেন, ব্যক্তিসাপেক্ষ ভাবনা বা বিষয়কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। ছোটবেলা থেকেই নারী ও পুরুষ সমাজে ভিন্ন ভাবে বড় হয়, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাদেরকে কাজ শেখানো হয়, পৃথক পৃথক ভূমিকা পালন করতে বলা হয়। নারী ও পুরুষের যাপিত অভিজ্ঞতা ভিন্ন হয়, সুতরাং তাদের নৈতিকতার ধারণাও ভিন্ন হওয়াটাই স্বাভাবিক। গিলিগান নৈতিকতার প্রেক্ষাপটে দরদকে অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৯৭০ সালে তিনি তাঁর *In a different Voice* গ্রন্থটি[৫] রচনা করেন এবং নারীর আত্মত্যাগ ও তার সমস্যার কথা বলেন। নারী অপরের সাথে সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখতে নিজের সত্তাকে অস্বীকার পূর্বক নিজের স্বরূপকে অবদমিত করে। আত্মত্যাগকে নারীর সদগুণরূপে নির্ধারণ করেছে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ। এরূপ গুণসম্পন্ন নারীকেই আদর্শ নারীর মর্যাদা দেওয়া হয়ে এসেছে। আর এই সমাজ প্রদত্ত আদর্শগুলিকে আয়ত্ত এবং সমাজের প্রত্যাশাপূরণ করতে গিয়ে নারী নিজের ভাবনা, ইচ্ছাকে গোপন করতে করতে ক্রমে নিজের থেকেই দূরে সরে গিয়েছে। গিলিগান মেয়েদের একটি ভিন্ন স্বরের কথা বলেন, যা তাদের অন্তরের স্বর। নিজের স্বার্থ চিন্তা ত্যাগ করে, সম্পর্ককে সর্বাধিক মূল্য দিতে গিয়ে, নারী নিজের স্বর হারিয়ে ফেলেছে। স্বর হল যাপিত অভিজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ। কেন্দ্রবাসীর জীবন-অভিজ্ঞতা এবং প্রান্তবাসীর জীবন-অভিজ্ঞতা ভিন্ন হবে এটাই স্বাভাবিক। তাই সেক্ষেত্রে একটি বিকল্প বা ভিন্ন স্বর থাকা জরুরী। গিলিগান নারীর দুই প্রকারের স্বরের উল্লেখ করেন। একটি হল- কৃত্তিম স্বর অর্থাৎ পুরুষতন্ত্রের মোড়কে

---

[৫] Gilligan, Carol. *In a Different Voice*, Harvard University Press, Cambridge, 1993.

আবৃত স্বর। অপরটি হল- ভিন্ন স্বর। এইরূপ স্বর পুরুষতন্ত্র থেকে ভিন্ন, নারীর স্বকীয় ভাষা। নারী তার এই অন্তরের স্বরকে অনেক ক্ষেত্রেই অনুভব করতে পারে না। সমাজ ও পরিস্থিতির চাপে অনেক সময় সে তার নিজের বক্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকে না। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই ভিন্ন স্বর উপলব্ধ হলেও অশান্তি এবং হেনস্থা এড়াতে নারী তার অন্তরের স্বরকে দমিয়ে রাখে।

গিলিগানের মতে, নারীর নীরবতার অনেকগুলি কারণ হতে পারে। এক, সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে গিয়ে ব্যক্তি-সত্তার স্বরকে উপস্থাপন করার প্রচেষ্টাকে স্বার্থপরতার নাম দেওয়া হয়ে থাকে। দুই, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীর বক্তব্যকে অগ্রাহ্য করা হয়, মূল্যহীন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তিন, সমাজে প্রাধান্য না পাওয়ার আশঙ্কা। নারীর মননে সর্বদা, সমাজে অবহেলিত এবং প্রান্তিকীকরণের আশঙ্কা থাকে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সার্বিক স্বরকে স্বীকার করা হয়। এক্ষেত্রে সমাজ স্বীকৃত স্বর থেকে পৃথক কোন স্বরের অনুরণন হলে, তাকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করা হয়। এই প্রকার পুরুষপক্ষপাতী সমাজে নারী তার ভিন্ন স্বরকে ব্যক্ত করতে সচেষ্ট হলে তাকে স্বার্থপর, নৈতিক ভাবে অপরিণতরূপে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। সুতরাং গিলিগান মনে করেন, উক্ত প্রকারের আশঙ্কাগুলির দরুণ নারী বরাবর তার অভ্যন্তরের স্বরকে আড়াল করতে উদ্যত হয়েছে। তিনি মূলত স্বর এবং সম্পর্ক নিয়ে কথা বলেন। পুরুষের অভিজ্ঞতাই মানব অভিজ্ঞতায় পর্যবসিত হয়ে এসেছে। পুরুষ-অভিজ্ঞতা তথা মানব-অভিজ্ঞতা নির্ভর ধ্রুপদী নীতিতত্ত্বে নারীর উপস্থিতি উপেক্ষিত হয়। নারীকে এরূপে নীরব করে রাখার প্রবণতার বিরুদ্ধে গিলিগানের আপত্তি শোনা যায়। চিরায়ত নীতিদর্শনে নৈতিকতার যে পুরুষপক্ষপাতী, একরৈখিক রূপটি তুলে ধরা হয়েছে, সেটি ছাড়াও নারীর একটি স্বতন্ত্র নৈতিক উপলব্ধি এবং বোধের দ্যোতনা রয়েছে। একজন নারী তার সৃজিত লিঙ্গ-ধর্মের প্রভাবে ভিন্ন প্রকার সম্পর্কের সার্থকতার মধ্য দিয়ে নিজের পরিচয় গড়ে তোলায় উদ্যত হয়। তাই বিমূর্ত, অনপেক্ষ

তত্ত্বসাধনা তার কাম্য নয়। কারণ নারী তার সম্পর্কিত সত্তাকে লালন করতে গিয়ে উপলব্ধি করেছে যে, কোনও সমস্যাকে নিছক বিমূর্ত, নৈর্ব্যক্তিক, পক্ষপাতশূন্য তত্ত্বের নিরিখে বিচার করা বাস্তবে কৃত্রিমতা বা যান্ত্রিকতার নামান্তর।

নৈতিক মূল্যায়ন দুই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে করা যেতে পারে বলে গিলিগান ব্যাখ্যা করেছেন। এক- চরম, সার্বিক, ও বিমূর্ত চিন্তনের দ্বারা। দুই- সম্পর্কিত, সাপেক্ষ এবং মূর্ত চিন্তনের দ্বারা। অধিকাংশ নারী দ্বিতীয় প্রকারে নৈতিক মূল্যায়ন করে থাকে। ধ্রুপদী নীতিবিদ্যায় সম্পর্ককে নির্ধারিত, স্থির ও সার্বিক বলা হয়। নারীর শূচিতা রক্ষার স্বার্থে, তাকে বিশেষ বা নির্দিষ্ট গন্ডীর মধ্যে রাখা হয়। মহত্বের সিংহাসনে বসিয়ে বাস্তবে তার মূল্যবোধকে অমর্যাদা করা হয়। পিতৃতন্ত্রে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষকে পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে গ্রাহ্য করা হয় না। এক্ষেত্রে পুরুষ প্রাধান্য পায় এবং নারীর ক্ষমতা, অবদানকে অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করা হয়। ফলস্বরূপ পুরুষ, নারীর উপর নির্ভরতাকে অস্বীকার করে। গিলিগানের মতে, নারীর এই নীরবতা যদিও তন্ত্রের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়ার স্বার্থে আত্মরক্ষার একটি মাধ্যম, তথাপি তিনি এই নীরবতাকে অনৈতিক মনে করেন। নারীর কৃত্রিম স্বর প্রকট হয়ে থাকে এবং ভিন্ন স্বর প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে। কিন্তু নারীর দায়িত্ব নিজের অন্তরের সত্তাকে জাগ্রত করা। ভাষার মাধ্যমে, বক্তব্যের মাধ্যমে এই পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে স্বর তুলতে হবে। কেবলমাত্র বিযুক্তির মাধ্যমেই, স্বাধীন চিন্তা করে পরিণত নৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়, একথা অযথার্থ। কিছু কিছু সংযুক্তি আমাদের ঋদ্ধ করে, সবল করে। তাই বলা যেতে পারে, এই ভিন্ন স্বরকে ভাষা প্রদান করার মাধ্যমেই, নারীর প্রান্তবাসী অবস্থানের উত্তরণ সম্ভবপর। [৬]

ধ্রুপদী নীতিশাস্ত্রে যথার্থ নৈতিক চিন্তনের মানদন্ডরূপে পক্ষপাতরাহিত্যকে প্রতিষ্ঠা করার যে প্রবণতা বর্তমান, তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন নারীবাদী নীতিতাত্ত্বিকগণ বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন।

---

[৬] Gilligan, Carol. 1993, pp. 10-12.

এই প্রসঙ্গে শুরুতেই **মেরিলিন ফ্রিডম্যান** বক্তব্যকে তুলে ধরা যেতে পারে। নীতিতত্ত্বে সাধারণত প্রত্যেক ব্যক্তির স্বার্থকে সমানভাবে বিবেচনা করার ক্ষেত্রে পক্ষপাতরাহিত্যের ব্যাখ্যা করা হয়। আধুনিক দর্শনের দুটি প্রধান নৈতিক ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে এই সাধারণ দাবিটি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উচ্চারিত হয়েছে। উপযোগবাদ অনুসারে, কোন ব্যক্তিকে পক্ষপাতরহিত হতে হলে তাঁর আচরণ দ্বারা যে সকল ব্যক্তি প্রভাবিত, সেই সকল মানুষের সুখকে বিবেচনা করতে হবে এবং সেই প্রত্যেক প্রভাবিত ব্যক্তির দুঃখ এবং সুখের ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। শত্রু, অপরিচিত ব্যক্তি বা বন্ধু প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই সঠিক কাজটি করতে হবে নিরপেক্ষভাবে। কান্টের নীতিতত্ত্বে নিরপেক্ষতার অর্থ হল, নৈতিক আইন বা নিয়ম-নীতির যথার্থ বৌদ্ধিক উপলব্ধি। এক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজস্ব বিষয়গত আবেগ, আনুগত্যকে উপেক্ষা করার কথা বলা হয়। কান্টের তত্ত্বানুসারে প্রতিটি ব্যক্তিকে সমানভাবে সম্মান করতে হবে, প্রত্যেককে অন্তর্নিহিতভাবে মূল্যবান হিসেবে দেখতে হবে। ব্যক্তির প্রাথমিক নৈতিক প্রেরণা হিসেবে নৈতিক নীতির প্রতি শ্রদ্ধা এবং কর্তব্যবোধ থাকা প্রয়োজনীয়। এমনকি খুব নিকট ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রেও উক্ত বিষয়গুলি প্রযোজ্য হবে। কান্টের নীতিতত্ত্বকেই সম্ভবত যথার্থ নিরপেক্ষ নীতিতত্ত্বের দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে বলে মেরিলিন ফ্রিডম্যান মনে করেন। তাঁর মতে, নিদেনপক্ষে দুইভাবে এই পক্ষপাতরাহিত্যের আদর্শটি নারীর নৈতিক সক্ষমতার অবমূল্যায়ন ঘটায়।

প্রথমত: পক্ষপাতরাহিত্যের আদর্শের অধীনত নীতিতত্ত্বগুলি সর্বদা নৈতিক আবেগ বা অনুভূতির তুলনায়, নৈতিক বৌদ্ধিকতার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। কারণ বহু যুগ ধরেই নারীকে বলা হয়ে এসেছে, সে অধিক আবেগপ্রবণ এবং পুরুষের তুলনায় কম বৌদ্ধিক বা যৌক্তিক। দ্বিতীয়তঃ এইপ্রকার তত্ত্বানুসারে, বিষয়গত স্বার্থের প্রতি পক্ষপাতমুক্ত হওয়া প্রয়োজনীয়। সুতরাং নিরপেক্ষতা দাবি করে, নৈতিক কর্তাকে বৌদ্ধিক হতে হবে এবং সর্বোপরি ব্যক্তিগত আনুগত্য, পরিকল্পনা ও আবেগ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হতে হবে।

কিন্তু মেরিলিন ফ্রিডম্যান মনে করেন, এই প্রকারের বিচ্ছিন্নতা, নিবিড় ব্যক্তিগত সম্পর্ক পালনের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষতিকারক। ঘনিষ্ট ব্যক্তিগত সম্পর্ককে যথার্থ ভাবে লালন করার জন্য প্রয়োজন মানসিক সংযুক্তি, প্রয়োজন প্রতিশ্রুতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া, ভালোবাসার মানুষটির বিশেষত্বের প্রতি দায়িত্ববান হওয়া। সুতরাং প্রত্যেকের প্রাথমিক নৈতিক প্রেরণা হিসেবে, প্রিয়জনের মঙ্গল সাধনের প্রতি উদ্বেগ বা চিন্তাকেই গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। অপরদিকে, নিরপেক্ষ বৌদ্ধিকতা ব্যক্তির জীবনের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্ককে, যথার্থ প্রেরণা বা ন্যায্যতা প্রদানে অসমর্থ। যদিও এই প্রকার সম্পর্কগুলি, ব্যক্তি জীবনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীনকাল থেকেই নারীর নৈতিক দিগন্তকে সীমাবদ্ধরূপে গণ্য করা হয়। যেহেতু নারী তার স্বভাবসিদ্ধভাবেই নিজের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্ক, বিশেষকরে তার পরিবারের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে থাকে, সেইহেতু ধরে নেওয়া হয় নারী তার এইপ্রকারের অঙ্গীকারগুলিকে অতিক্রম করে ন্যায্যতা রক্ষার ক্ষেত্রে অসমর্থ। এই প্রসঙ্গে ফ্রিডম্যানের মত হল, নিকট ব্যক্তিগত সম্পর্কের নৈতিক গুরুত্বকে অবমূল্যায়ন করার মাধ্যমে ধ্রুপদী নিরপেক্ষতার আদর্শগুলি নারীর নৈতিক সামর্থ্য এবং সচেতনতাকে অশ্রদ্ধা ও অসম্মান করে। সমাজ, নারীর যে ঐতিহ্যগত বা সনাতন ভূমিকা নির্ধারণ করে রেখেছে, সব নারী সেই ভূমিকা গ্রহণ করে না। কিন্তু সমাজ তখনই নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়, যখন সে নিজেকে সমাজ দ্বারা নির্ধারিত সনাতনী নারীসুলভ কর্মে লিপ্ত করে। অনেক নারীবাদী এইপ্রকার দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হন যে, আবেগ এবং মনোযোগ এই বিষয় দুটি মানুষের খুব কাছের ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে খুবই জরুরী। এই মূল্যবোধগুলি আমাদের নিকট, ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সাথে ভীষণভাবে যুক্ত হয়ে থাকে।

১৯৮২ সালে নৈতিক মনস্তত্ত্ববিদ ক্যারল গিলিগান ব্যাখ্যা করেন, তিনি স্বতন্ত্র নারীর নৈতিক স্বর বলতে ঠিক কি বোঝাতে চাইছেন। গিলিগানের রচনায় দরদের প্রতি একটি

নৈতিক অভিযোজন দেখানো হয়েছে। ধ্রুপদী নীতিবিদ্যার মতে নারীর নৈতিক দৃষ্টিকোণের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হল, অপরের প্রতি আবেগপ্রবণ এবং দরদী হওয়া। ধ্রুপদী নীতিবিদ্যার এইপ্রকার মতের সাথে গিলিগান সহমত পোষণ করেন। তথাপি তাঁর আপত্তির জায়গা হল, মূলস্রোতের নীতিতত্ত্বে নারীর এইপ্রকার বৈশিষ্ট্যকে নৈতিক ঘাটতি বা অভাবরূপে ব্যক্ত করা হয়েছে। কিন্তু গিলিগান নারীর এই দরদ বা আবেগের বৈশিষ্ট্যকে নৈতিকতার ক্ষেত্রে সমমর্যাদা প্রদান করেছেন। নিরপেক্ষ নৈতিক তত্ত্বগুলিতে প্রত্যেকের প্রতি সমান গুরুত্বের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয় এবং যেকোন প্রকার নির্দিষ্ট ব্যক্তিগত স্বার্থের অনুপস্থিতি দাবি করা হয়। কিন্তু দরদী নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী নিরপেক্ষ নৈতিকতার এইরূপ বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে। কান্টের নৈতিক তত্ত্বে বলা হয়, ব্যক্তি নৈতিক নীতির প্রতি কর্তব্যবোধ বা বৌদ্ধিক শ্রদ্ধা থেকে নৈতিক প্রেরণা পেয়ে থাকে। কিন্তু দরদী অভিযোজনের ক্ষেত্রে দাবী করা হয়, নিকট, ভালবাসার মানুষের প্রতি সরাসরি আবেগময় উদ্বেগের দরুন অধিক নৈতিক প্রেরণা লাভ করা সম্ভব।

এই প্রসঙ্গে **ব্লাম**- এর মতামতের উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর বক্তব্য, অপরিচিত কোন মানুষের প্রতিও যদি দয়া বা মহত্ব দেখানো হয়, তাহলে সেটিও আর নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থাকে না। কারণ এক্ষেত্রে কোন একজন ব্যক্তি-বিশেষের নির্দিষ্ট প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে, সেই অনুযায়ী তাকে সাহায্য করা হচ্ছে, অর্থাৎ এক্ষেত্রেও একপ্রকার মানসিক আবেগ কাজ করছে। নিরপেক্ষভাবে কিন্তু এই সাহায্য করা হচ্ছে না।[৭]

[৭] Blum, Lawrence. "Particularity and Responsiveness." *The Emergence of Morality in Young Children*, ed. J. Kagan and S. Lamb, Chicago, IL: University of Chicago Press, 1987, pp. 321-35.

নিরপেক্ষ নীতিতত্ত্বের সমর্থকরা এইপ্রকার সমালোচনার প্রতি ব্যাপকভাবে প্রতিক্রিয়া দেন, এবং সবিস্তারে এর ব্যাখ্যা করেন। এক্ষেত্রে অবশ্য তাঁরাও একটি বিষয়ে সহমত পোষণ করেন যে, নিবিড়-ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলি মানুষের জীবনকে পরিপূর্ণ করে। প্রত্যেক মানুষ নিজেদের ভালবাসার বা কাছের মানুষের প্রতি যে সাপেক্ষ উদ্বেগ উপলব্ধি করে, সেই সমমানের উদ্বেগ সে অপর ব্যক্তির ক্ষেত্রে উপলব্ধি করতে পারে না। কিছু কিছু নিরপেক্ষ নীতিতাত্ত্বিকদের মতে, নৈতিক নীতি এবং নৈতিক সিদ্ধান্তকে ন্যায্যতা প্রদান করার ক্ষেত্রে, ব্যক্তির নিরপেক্ষ অবস্থান প্রয়োজনীয়। কিন্তু মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের নৈতিক অবস্থা বা পরিস্থিতিতে এইরূপ নিরপেক্ষ অবস্থান থাকা আবশ্যিক বা প্রয়োজনীয় নয়। একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে তার প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় সম্মুখীন হওয়া প্রত্যেক মানুষের প্রতি, সমানভাবে ভালো বা উপকার করা সম্ভব নয়।

নিরপেক্ষতাবাদীরা মনে করেন, আমাদের সাপেক্ষ ভালোবাসা এবং আনুগত্য তখনই নৈতিকভাবে অনুমোদনযোগ্য এবং প্রয়োজনীয় হবে, যখন তাদের একটা নিরপেক্ষ এবং বিষয়গত পক্ষপাশূন্য অবস্থান থেকে ব্যাখ্যা করা যাবে। অর্থাৎ বলাবাহুল্য, সকল প্রকার সাপেক্ষ অনুভূতি বা আনুগত্যকে সর্বদা বৌদ্ধিকভাবে ন্যায্য হতে হবে, যাতে ব্যক্তি তার নিজের স্বার্থ বা যাদের প্রতি তার বিশেষ উদ্বেগ আছে, তাদের প্রতি অধিক বা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ না করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, যদি কোন মা তার সন্তানের প্রতি অধিক যত্নশীলা হন, তাহলে সেটিকে অবশ্যই নিরপেক্ষভাবে স্বীকৃত হতে হবে। ব্যক্তির বিষয়ীগত পছন্দ বা অনুরক্তিকে অনুসরণ করলে চলবে না। তবেই সেই সন্তানের প্রতি অধিক যত্নবান হওয়াকে, নৈতিকভাবে সঠিক এবং অনুমোদনযোগ্য বলা যাবে। যাঁরা মনে করেন, নিরপেক্ষভাবে কর্তব্য করার উদ্দেশ্যেই কর্তব্য করা উচিত, তাঁরা বলেন, কোন একটি কাজের নৈতিক যথার্থতাই, সেই কাজটিকে করার যথেষ্ট এবং যথার্থ কারণ। আবার অপরদিকে, কোন একটি কাজের নৈতিক অযথার্থতাই সেই কাজটিকে না করার পক্ষে যথেষ্ট কারণ, অর্থাৎ কোন কাজকে করা

বা না করার কারণ হিসেবে প্রতিপন্ন করা হবে সেই কাজটির নৈতিক যথার্থতা বা অযথার্থতাকে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার জীবনের লক্ষ্য স্থির করার ক্ষেত্রে বা কোন প্রকল্প নির্বাচন করার ক্ষেত্রেও, সেগুলির নৈতিক যথার্থতা এবং অযথার্থতা মাথায় রাখতে হবে। অর্থাৎ এমন কোন কাজ বা প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে না যেটি নৈতিকভাবে অযথার্থ। একজন যথার্থ নৈতিক কর্তা, কেবলমাত্র নৈতিকভাবে অনুমোদিত কাজগুলি করার জন্যই দায়বদ্ধ থাকবেন। ভালোবাসা, ভরসা, মানুষের আস্থাভাজন হওয়া প্রভৃতি বিষয়গুলি স্বরূপত মানুষকে কাজের ক্ষেত্রে প্রেরণা দেয় না। অধিকাংশ সময়ে, ভালোবাসা বা ভরসা করার কারণেই ব্যক্তির পদস্খলন হয়ে থাকে। ভালোবাসা আমাদের সর্বদা সঠিক পথে চালনা করে না। অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তি তার ভালোবাসার বা ভরসার মানুষের কল্যাণ করার স্বার্থে, নৈতিকভাবে অযথার্থ কাজ করে থাকেন।

এই প্রসঙ্গে হারম্যান বলেন, দরদের উদ্দেশ্যের তুলনায় কর্তব্যের উদ্দেশ্য অনেক বেশি ভরসাযোগ্য, কারণ কর্তব্যের উদ্দেশ্যের সঙ্গে দরদের উদ্দেশ্যকে অনায়াসে জুড়ে দেওয়া সম্ভব।[৮] একজন কর্তব্যপরায়ণ মানুষ যত্নশীল হতেই পারেন, অর্থাৎ অপরের প্রতি কর্তব্য পালনের সাথে সাথে তার প্রতি মরমী থাকা সম্ভব। কর্তব্যের অনুষঙ্গেই স্নেহ বা মমতা থাকতে পারে। কর্তব্য রক্ষার অর্থ কখনই স্নেহ, যত্ন বা মমত্বকে বাদ দেওয়া নয়। হারম্যানের মতাদর্শ, কান্টের নীতিতত্ত্বের দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হলেও, তিনি কিছুটা ভিন্ন কথা বলেছেন। তাঁর মতে সর্বাপেক্ষা ভালো আবেগ এবং যত্নশীল সংযুক্তি সেগুলি হবে, যে আবেগ ও সংযুক্তিগুলি, নৈতিকতা বা নৈতিক বোধ দ্বারা চালিত হবে। কোন ব্যক্তির যদি নৈতিক দায়বদ্ধতা, বা নৈতিক কর্তব্যবোধ যথার্থভাবে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে কর্তার আবেগ বা যত্নশীল সংযুক্তিগুলিও যথার্থই হবে।

---

[৮] Herman, Barbara. "The Practice of Moral Judgment." *The Journal of Philosophy*, vol. 82, no. 8, 1985, pp. 414–36.

নিরপেক্ষতাবাদীরা একটি বিষয়ে বারংবার সচেতন করে এসেছেন যে, বিশেষ বা নির্দিষ্ট কিছু মানুষের প্রতি দরদ, প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকার, উদ্বেগ প্রভৃতি থাকা অনেক ক্ষেত্রেই নৈতিকভাবে বিপদজনক হয়ে উঠতে পারে। কিছু প্রকারের সাপেক্ষতা নৈতিক প্রেক্ষিতে অনেক সময় অসুবিধাজনক হয়ে দাড়ায়। সাপেক্ষতার উপর অতিরিক্ত জোর দিলে সংকীর্ণ নৈতিক আচরণ ছাড়পত্র পেয়ে যেতে পারে, যথা- কেবলমাত্র বা নিছকই নিজের পরিবার, ঘনিষ্ঠ-বান্ধব, পরিজনের প্রতি উদ্বেগ প্রকাশ করার ন্যায় সংকীর্ণ ব্যবহার নৈতিকতার পরিসরে ছাড়পত্র পেয়ে যাবে।

নিরপেক্ষতাবাদীরা আরো বলেন, কোনও সাপেক্ষ আচরণকে নৈতিকভাবে অনুমোদনযোগ্য হতে হলে, তার একটি নিরপেক্ষ নৈতিক নীতিগত ভিত্তি থাকতে হবে, অর্থাৎ নিরপেক্ষ নীতির উপর ভিত্তি করেই নির্বাচন করতে হবে কোন প্রকারের সাপেক্ষ আচরণগুলিকে নৈতিকভাবে অনুমোদন করা যাবে। পক্ষপাতরাহিত্যের আদর্শটিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে একটি নতুন পন্থা অবলম্বন করে দাবী করা হয়, নৈতিক যৌক্তিকতার ক্ষেত্রে এই নিরপেক্ষতাকে ব্যবহার করতে হবে, অর্থাৎ পক্ষপাতরাহিত্যের একটি পরিধি আছে, কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। সর্বোচ্চ ও সর্বস্তরে এই নিরপেক্ষতার প্রয়োজন নেই। তবে নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে এই নিরপেক্ষতার ভূমিকা অবশ্য প্রয়োজনীয়। সুতরাং নিরপেক্ষতাবাদীরা মনে করেন, নৈতিক প্রেক্ষাপটে পক্ষপাতরাহিত্যের অবদান স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। ফলে নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এবং নৈতিক যৌক্তিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে এই নিরপেক্ষতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বর্তমান। এইপ্রকার নিরপেক্ষতার সমালোচক নারীবাদীরা মূলত দুটি প্রশ্নের উত্থাপন করেন, এক- নৈতিক বিচারের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কর্তার নিরপেক্ষ অবস্থান কি আবশ্যিক শর্ত? দুই- নাকি নৈতিক যৌক্তিকতা অর্জনের জন্য নিরপেক্ষতার এই আদর্শটি একটি পর্যাপ্ত শর্ত?

এক্ষেত্রে নারীবাদীর মধ্যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন নারীবাদী ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করেন। কিছু কিছু নারীবাদী মনে করেন, নৈতিক কর্তার ক্ষেত্রে পক্ষপাতরহিত

অবস্থান গ্রহণ করা প্রয়োজনীয়, হয়তো বা আবশ্যিক। কিন্তু নৈতিকতার প্রেক্ষিতে এটিকে কখনোই পর্যাপ্ত শর্তরূপে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় নয়। তবে অধিকাংশ নারীবাদীরাই মনে করেন এই পক্ষপাতরাহিত্যের আদর্শটি বাস্তবে ব্যবহার অনুপযোগী। সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ অবস্থান অর্জন করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভবপর নয়। যে সকল নারীবাদী সম্পর্কিত সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী তাঁরা মনে করেন মানুষের চিন্তন-ভাবনা কখনোই তার অর্থনৈতিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি প্রেক্ষাপট থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গড়ে উঠতে পারে না। এই মত অনুযায়ী-

> "...impartiality is useless for moral justification since it constitutes an Impossibile human attainment. Human thinking cannot be entirely detached from the social or historical context of its origin, nor can it be completely severd from its motivating passions and commitments." [৯]

নৈতিক যৌক্তিকতার ক্ষেত্রে পক্ষপাতরাহিত্যের আদর্শটি অপ্রয়োজনীয়, কারণ এইরূপ আদর্শটি অবাস্তব এবং ব্যক্তির পক্ষে এটিকে অর্জন করা অসম্ভব। এইরূপ প্রেক্ষিত-বিবর্জিত অবস্থান স্বীকার করা কৃত্রিমতার নামান্তর।

বিশিষ্ট দার্শনিকগণেরা যে যে পন্থার মাধ্যমে নিরপেক্ষতাকে অর্জন করার কথা উল্লেখ করেছেন, তাদের মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য পন্থা হল, অজ্ঞতার আবরণ এবং সার্বজনীনতা। কিন্তু ফ্রিডম্যান মনে করেন, উক্ত পদ্ধতিগুলির ব্যবহারের মাধ্যমে নিরপেক্ষতা অর্জন করা যায়-

---

[৯] Friedman, Marilyn. "Impartiality." *A Companion to Feminist Philosophy*, Alison M. Jaggar and Iris Marion Young (eds.), Massachusetts: Blackwell Publishers Inc., 1998, p. 397.

এইরূপ দাবির যথেষ্ট নির্ভরযোগ্যতা নেই। তাঁর মতে, অজ্ঞতার আবরণ বা সার্বজনীনতার সাহায্যে নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব কিনা, সেটি প্রমাণ করার কোন ভরসাযোগ্য পন্থা নেই। সম্পূর্ণরূপে পক্ষপাতশূন্য থাকা মানুষের পক্ষে আদৌ সম্ভব কিনা, সেই প্রশ্নকে এড়িয়ে গিয়ে অনেক নারীবাদীরা আবার মনে করেন, পক্ষপাতরাহিত্যের আদর্শটি হয়তো কার্যকরী বা প্রয়োজনীয়। তথাপি নৈতিকতার ক্ষেত্রে এই আদর্শটির পরিধি সীমিত। তাঁদের মতে-

> "...the impartial standpoint applies mainly to the public realm of impersonal relationships and to the exercise of formal offices defined by duties of fairness. It is not capable of justifying or properly motivating all the various behaviors that we intuitively regard as morally necessary or important to personal relationship." [১০]

এরূপ বক্তব্য অনুসারে, পক্ষপাতরাহিত্যের আদর্শটি নৈতিক প্রেক্ষাপটে আবশ্যিক ও ব্যবহারোপযোগী বটে, কিন্তু তা পর্যাপ্ত কখনই নয়। নৈর্ব্যক্তিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এইপ্রকার নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী প্রযোজ্য হয়। যেকোনো সংগঠনে নির্দিষ্ট কিছু সাংগঠনিক নিয়ম-নীতি থাকে। এক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বলাবাহুল্য ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে, নৈতিকভাবে প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ আচরণগুলিকে, ন্যায্যতা প্রদানে অক্ষম এই নিরপেক্ষতা। নিকট বন্ধুত্বের সম্পর্কের ক্ষেত্রে, ব্যক্তির দরদী দৃষ্টিভঙ্গী রাখাটা অধিক জরুরী। বন্ধুত্ব বা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের চাহিদাগুলি পূরণ করতে হলে, নিরপেক্ষ উদ্দেশ্যের পরিবর্তে দরদী দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করা অধিক কাম্য। ব্যক্তির নৈতিক যথার্থতার জন্য ভালোবাসা, আনুগত্য, দরদ, অঙ্গীকারবদ্ধতা প্রভৃতি থাকাই যথেষ্ট।

---

[১০] Friedman, Marilyn. 1998, p. 397.

আরেকদল নারীবাদী মনে করেন, দরদ এবং মরমী সম্পর্ক কেবলমাত্র ব্যক্তি জীবনে প্রয়োজন হয় এমনটা নয়, নিরপেক্ষ নৈতিকতাতেও এর গুরুত্ব বর্তমান। তাঁদের বক্তব্য হল, ধ্রুপদী নীতিবিদদের এটি ভ্রান্ত ধারণা যে, নিরপেক্ষ বৌদ্ধিকতার ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্ক, দরদ, আনুগত্য প্রভৃতিগুলি অপ্রয়োজনীয়। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে ন্যায্যতার প্রয়োজন যেমন আছে, তেমনি দরদ ও আবেগেরও প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত।

অপর একদল নারীবাদী বলবেন, শুধুমাত্র নিরপেক্ষ নৈতিক বৌদ্ধিকতা বললে, যথার্থ বা সম্পূর্ণরূপে বলা হয় না। নিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে প্রয়োজন হল ব্যক্তিকে এবং তার অবস্থানকে বোঝা। এই নিরপেক্ষতার আদর্শে কোন একটি বিশেষ বর্গের বা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সাধারণীকরণ করে, ব্যক্তিকে বোঝার কথা বলা হয়। কিন্তু নারীবাদীরা এর আপত্তি জানিয়ে বলেন, উক্তপ্রকার পন্থা অবলম্বন করলে প্রতিটি প্রসঙ্গের নির্দিষ্টতা বা পুঙ্খানুপুঙ্খতা, প্রত্যেক পরিস্থিতির বিশিষ্টতা এবং অনন্যতাকে অগ্রাহ্য করা হয়। কারণ নৈতিক বোধের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির বিশেষতাকে উপলব্ধি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং বলা যেতে পারে, নিরপেক্ষ বৌদ্ধিকতার অপর্যাপ্ততা রয়েছে, কারণ এক্ষেত্রে মানুষের বিভিন্নতা স্থান পায় না। নিরপেক্ষ চিন্তনের ক্ষেত্রে সাধারণীকরণযোগ্যতার উপর ভরসা করা হয়ে থাকে। কিন্তু ফ্রিডম্যানের মতে, এইপ্রকার সাধারণীকরণের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে নিরপেক্ষতার মোড়কে আবৃত পক্ষপাতকে আড়াল করার প্রচেষ্টা করা হয়। নিরপেক্ষ বৌদ্ধিকতা উক্তপ্রকার পক্ষপাতকে নির্মূল করতে অক্ষম। আপাত পক্ষপাতরহিত, নৈর্ব্যক্তিকতার মধ্যে লুকিয়ে আছে সামাজিক উচ্চ-নীচ স্তরভেদ, যেটি গড়ে উঠেছে যৌক্তিক কাঠামোর ভিত্তিতে। ব্যক্তিকে উপলব্ধি করা এবং তাঁর অভিজ্ঞতাকে বোধ করা হল একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতি ব্যক্তির সাংস্কৃতিকভাবে প্রাপ্ত নৈতিক প্রতিচ্ছবি এবং ধারণাকে বহন করে নিয়ে চলে। এইরূপ নিরপেক্ষ বৌদ্ধিক প্রস্তাবনার মাধ্যমে সমাজের প্রভাবশালী মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রকাশ করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। আর সমাজের প্রান্তিক,

অবহেলিত, বঞ্চিত মানুষের পরিচয়, দৃষ্টিভঙ্গী এবং অভিজ্ঞতাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভ্রান্তরূপে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে।

প্রত্যেক নৈতিক কর্তার নিরপেক্ষ চিন্তনের ক্ষেত্রে, কিছু প্রচলিত ব্যবস্থা বা পদ্ধতি প্রস্তাবিত হয়ে থাকে। কিন্তু ফ্রিডম্যানের মনে করেন, উক্তপ্রকার তথাকথিত পক্ষপাতরহিত চিন্তনের জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলিতে বিশেষভাবে লক্ষণীয় অসংগতি এবং পক্ষপাত না থাকায় সাধারণ মানুষ সেগুলিকে বোধ করতে অক্ষম। ফলত তারা এরূপ নিরপেক্ষতার অন্তরালে ঘটে চলা পক্ষপাতকে চিহ্নিত করে তার বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করতে অসমর্থ হয়ে থাকে। প্রতিটি সমাজে সাংস্কৃতিকভাবে যেসকল পক্ষপাতগুলি গেঁথে রয়েছে, সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নৈতিক কর্তার নিকট স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় না। সুতরাং ফ্রিডম্যানের মতে, একজন যোগ্য এবং যথার্থ নৈতিক কর্তার চিন্তাশীল ও প্রতিফলনসমৃদ্ধ কৌশল অবলম্বন করা আবশ্যক। তাহলেই একজন যোগ্য নৈতিক কর্তা নিরপেক্ষ নৈতিক চিন্তনের মোড়কে আবৃত, সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তির অন্তর্গত গোষ্ঠীভিত্তিক পক্ষপাতকে চিহ্নিত করে তার সংশোধন করতে সমর্থ হবেন।

ফ্রিডম্যান এই প্রসঙ্গে মেয়েরস-এর (Meyers,1994) বক্তব্যের উল্লেখ করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে, ন্যায়বিচার বা ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পক্ষপাতরহিত চিন্তনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে ঠিকই কিন্তু এটি অপর্যাপ্ত, অর্থাৎ যথার্থরূপে ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কেবল প্রেক্ষিতনিরপেক্ষ চিন্তন নয়, আরো কিছু নৈতিক সামর্থ্য এবং সম্পদ যথা- অপরের প্রতি সহানুভূতি, সহমর্মিতা প্রভৃতিগুলিও আবশ্যক। ধ্রুপদী নীতিদর্শনে নিরপেক্ষতার আদর্শ বিষয়ক ধারণাটিকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যার ফলে নৈতিক যৌক্তিকতার জটিলতাকে অগ্রাহ্য করে অতিসরলীকরণ এবং ভ্রান্ত উপস্থাপনা করা হয়েছে।[১১]

---

[১১] Meyers, D. *Subjection and Subjectivity: Psychoanalytic Feminism and Moral Philosophy*, New York: Routledge, 1994.

মূলস্রোতের নীতিবীক্ষায় পক্ষপাতরাহিত্যকে একক প্রতিষ্ঠানরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। একজন বিচ্ছিন্ন বৌদ্ধিক কর্তা, এককভাবে নিজের মেধা, বৌদ্ধিক সম্পদের উপর আস্থা রেখে, কোনও ভাবে অপরের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে উক্তপ্রকার নিরপেক্ষতার আদর্শকে অর্জন করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু নিরপেক্ষতার এরূপ চিত্রটি বাস্তবে নৈতিক জ্ঞানের আসল রূপটিকে গোপন করে রাখে, কারণ যথার্থ নৈতিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে আবশ্যক সামাজিক অংশগ্রহণ। নৈতিক জ্ঞান বা বোধকে সকলের সাথে ভাগ করে নেওয়াই হল এর যথাযথ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, এককরূপে নিরপেক্ষ মননের দ্বারা যথার্থ নৈতিক জ্ঞান অর্জন সম্ভবপর নয়। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী ও মননের মানুষের পরস্পরের সাথে আলাপচারিতা এবং মতামত আদান-প্রদানের মাধ্যমে গড়ে উঠবে সর্বোৎকৃষ্ঠ নৈতিকবোধ। যথার্থ নৈতিকবোধ অর্জন করতে গেলে নিরপেক্ষতার আদর্শকে একক অভিযান বা প্রতিষ্ঠানরূপে ব্যাখ্যা না করে ভিন্ন ভিন্ন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর ভিন্নতাকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

যদি নিরপেক্ষতাকে সকল প্রকার নৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায্যতার একটি পর্যাপ্ত শর্তরূপে গ্রহণ করাও হয়, তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে কেবলমাত্র নৈতিক ন্যায্যতাই শেষ কথা নয়। এছাড়া নৈতিক বোধশক্তি থাকাও অত্যন্ত জরুরী। ন্যায্যতার প্রতি মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপের ফলে, ধ্রুপদী নীতিদর্শনে নৈতিক উপলব্ধিকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। ন্যায্যতার আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে থাকার দরুণ চিরাচরিত নীতিতত্ত্বগুলিতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে উপেক্ষা করা হয়েছে। যেসকল সামর্থ্যগুলি ব্যক্তিসত্তার উন্নয়নের মূলে অবস্থিত, সেগুলির প্রতিফলন তার নৈতিকবোধে উপস্থিত। এক্ষেত্রে নারীর প্রতি বিশেষ উদ্বেগ রাখা আবশ্যক। নারীর যে বিশেষ সামর্থ্য বা ভূমিকা রয়েছে সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে, সেই শ্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বর্তমান নৈতিকতার প্রেক্ষিতে। কারণ মানুষের নৈতিক মনন বা বোধ গড়ে ওঠার যে প্রক্রিয়া, সেক্ষেত্রে নারীর প্রতিপালনের শ্রমের অসীম অবদান উপস্থিত। আমাদের বেড়ে ওঠার সময় যে নৈতিক

বিকাশ সম্পন্ন হয়, পরবর্তীতে তারই প্রতিফলন আমাদের নৈতিকবোধে পরিলক্ষিত হয়। আর যথার্থ নৈতিকবোধ বা উপলব্ধির সাহায্যেই যথাযথ নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।[১২]

নিরপেক্ষতার প্রতি অত্যধিক মনোনিবেশ করার দরুণ দার্শনিকগণ নৈতিক বোধের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অপর সামর্থ্যগুলির প্রতি উদাসীন। যদি বাস্তবে মানব চাহিদা এবং পরিস্থিতিকে উপলব্ধি করতে হয় তাহলে কেবলমাত্র নিরপেক্ষতাকে নয়, অন্যান্য সামর্থ্য যথা-নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি যত্নশীল মনোযোগ বা দরদী ভাবাপন্ন হওয়াকেও মান্যতা দিতে হবে নৈতিক প্রেক্ষাপটে।[১৩]

ফ্রিডম্যান আরো বলেন, পক্ষপাতরাহিত্য বিষয়ে বিভিন্ন নারীবাদীদের বক্তব্যের সারসংক্ষেপরূপে বলা যেতে পারে, পক্ষপাতরাহিত্য এবং নীতিতত্ত্বের সম্পর্ক প্রসঙ্গে নারীবাদীর মূলত দুই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী পাওয়া যায়। প্রথমত- এই নিরপেক্ষতার আদর্শটি নৈতিক বিচার বা ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি আংশিক শর্ত বা আদর্শ। নৈতিক যৌক্তিকতার জন্য এই নিরপেক্ষতার আদর্শটি আংশিকভাবে জরুরী। এটির সঙ্গে আরো কিছু নৈতিক সামর্থ্য এবং সম্পদের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যথার্থ নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ নিরপেক্ষ অবস্থান অবলম্বনের আবশ্যকতা আংশিকভাবে বর্তমান। কিন্তু নৈতিকতার ক্ষেত্রে এই নিরপেক্ষতার আদর্শটি কোনভাবেই পর্যাপ্ত শর্ত নয়। দ্বিতীয়ত- এই নিরপেক্ষতার আদর্শটি অলভ্য এবং সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর একটি আদর্শ। সুতরাং নৈতিকতার প্রেক্ষাপটে এই পক্ষপাতিরাহিত্যের ধারণাটি সম্পূর্ণ অকার্যকরী।

---

[১২] Calhoun, C. "Justice, Care, Gender Bias."*Journal of Philosophy*, 85: 9 1988, pp. 456-8.

[১৩] Blum, Lawrence. *Moral Perception and Particularity*, Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

যে সকল নারীবাদী প্রথম প্রকারের মতামত পোষণ করেন, অর্থাৎ যাঁদের মতে নৈতিকতার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার কিছু হলেও আবশ্যকতা বর্তমান, তাঁদের মধ্যেও আবার একটি বিষয়ে মতান্তর পরিলক্ষিত হয় যে, এই অনপেক্ষতার আদর্শটি কি শুধুমাত্র নৈর্ব্যক্তিক সম্পর্ক এবং চিরাচরিতরূপে সংজ্ঞায়িত ভূমিকার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে, নাকি এটির পরিধি মানুষের ব্যক্তি জীবন নিকট পারিবারিক সম্পর্ক দরদী সম্পর্কগুলির ক্ষেত্রেও প্রসারিত হবে। একদল নারীবাদী মনে করেন, নৈর্ব্যক্তিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেই কেবল নিরপেক্ষ অবস্থান অবলম্বন প্রয়োজন। আবার অপরপক্ষের মতানুসারে আমাদের নিকট ব্যক্তিগত সংযোগের ক্ষেত্রেও এই নিরপেক্ষতা আংশিভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

মেরিলিন ফ্রিডম্যান মনে করেন, ধ্রুপদী নীতিদর্শনে জগতকে দেখার একমুখী দৃষ্টিভঙ্গী দেওয়া হয়। নিরপেক্ষতার আদর্শের মুখোশের আড়ালে বাস্তবত পক্ষপাত করা হয়েছে। মানুষমাত্রই বৌদ্ধিকতার দ্বারা চালিত হয়ে যথার্থ নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, সকল প্রকার ভাবাবেগ, সাপেক্ষ চিন্তনকে উপেক্ষা করবে- এরূপ দাবী করার অর্থই পক্ষপাত করা। প্রত্যেক ব্যক্তির বিশিষ্টতাকে, বিভিন্নতাকে, বৈচিত্র্যতাকে অবজ্ঞা করে, মূলস্রোতের নৈতিকতায় মানুষের উপর পরিস্থিতি নিরপেক্ষভাবে, বোঝাস্বরূপ এই নিরপেক্ষতার আদর্শকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফ্রিডম্যান মনে করেন, প্রত্যেক নৈতিক কর্তার নৈতিক চিন্তন ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, অথচ ধ্রুপদী নৈতিকতায় বিভিন্ন প্রকার মানুষের নৈতিক বিচারের ভিন্নতাকে অগ্রাহ্য করে, ব্যক্তির জটিল চিন্তন প্রক্রিয়ার সরলীকরণ করা হয়।

এবারে অপর একজন নারীবাদী আইরিশ ইয়ং-এর বক্তব্য তুলে ধরা যাক। মূলস্রোতের তত্ত্বগুলিতে নিরপেক্ষতার আদর্শকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে, কীভাবে পক্ষপাত করা হয়ে থাকে, সেই বিষয়ে আলোকপাত করেন ইয়ং তাঁর “The Ideal of Impartiality and the

Civic Public" প্রবন্ধে।[১৪] তাঁর মতে, নীতিতত্ত্বে নিরপেক্ষতাকে যথার্থ মানদন্ডরূপে গ্রাহ্য করার উদ্দেশ্য হল– সাম্যতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সকল প্রকার ভিন্নতাকে দূরীভূত করা। কিন্তু বাস্তবে এই নিরপেক্ষতার ধারণাটি একটি দ্বিকোটিক বিভাজনের সৃষ্টি করেছে, যার ফলে বৌদ্ধিকতা ও আবেগের মধ্যে, বর্হিজগত ও অভ্যন্তরীণ জগতের মধ্যে এবং সর্বোপরী সামান্য ও বিশেষের মধ্যে একপ্রকার বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। ইয়ং বলেন,

> "I argue that the ideal of impartiality in moral theory expresses a logic of identity that seeks to reduce differences to unity. The stances of detachment and dispassion that supposedly produce impartiality are attained only by abstracting from the particularities of situation, feeling, affiliation, and point of view. These particularities still operate, however, in the actual context of action. Thus the ideal of impartiality generates a dichotomy between universal and particular, public and private, reason and passion. It is, moreover, an impossibl e ideal, becaus e the particularities of context and affiliation cannot and should not be removed from moral reasoning."[১৫]

মূলস্রোতের নীতিশাস্ত্রে, পুরুষের সাথে বৌদ্ধিকতা এবং নারীর সাথে আবেগের সমীকরণ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। নৈতিক সিদ্ধান্ত নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রধান প্রয়োজনীয় বিষয়রূপে

---

[১৪] Young, Iris Marion. "The Ideal of Impartiality and the Civic Public." *Justice and the Politics of Difference.* Princeton University Press, 1990, pp. 96-121.

[১৫] Young, Iris Marion." 1990, p. 97.

বৌদ্ধিকতাকে স্থাপন করা হয়। সুতরাং আবেগময়তাকে, নৈতিক সিদ্ধান্ত নির্মাণের প্রক্রিয়া থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়। বলাবাহুল্য, নারীবাদীর কাছে এরূপ নিরপেক্ষ যুক্তিনির্ভর, বৌদ্ধিক নীতিশাস্ত্র পুরুষ-পক্ষপাত দোষে দুষ্ট।

ইয়ং মনে করেন, মূলস্রোতের নীতিতত্ত্ব সার্বজনীন নিরপেক্ষতার নামান্তরে প্রেক্ষিতের বিশেষতাকে অগ্রাহ্য করে। ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতের অবস্থানের ভিন্নতাকে অগ্রাহ্য করে, প্রেক্ষিত নিরপেক্ষতার এই ধারণাটি কিছু আদর্শগত ভূমিকা পালন করলেও বাস্তবে এই ধারণার প্রয়োগ অসম্ভব এবং অনাবশ্যক। তাঁর মতে, সমাজের কেন্দ্রে অবস্থিত, ক্ষমতা সম্পন্ন শ্রেণীর মানুষ এরূপ সার্বিক, নিরপেক্ষতার দাবী করে নিজেদের একপাক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গীকে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী বলে প্রতিষ্ঠা করেএসেছে। আর সেই তথাকথিত নিরপেক্ষতার আদর্শের মাধ্যমে নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উচ্চ-নীচ স্তরভেদযুক্ত পরিকাঠামোকেই সুদৃঢ় করেছে। এই নিরপেক্ষতার আদর্শের মাধ্যমে মানুষের প্রকৃতি অথবা তার নৈতিক মনস্তত্ত্বের বিষয়গত পূর্বানুমান করা হয়েছে। অতএব বলা যায় যে, মানুষের চারিত্রিক এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশেষতাকে অগ্রাহ্য করে, নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সার্বিকতাকে প্রতিষ্ঠা করা হয় মূলস্রোতের নীতিবিদ্যায়। ইয়ং-এর মতে-

> "In the history of Western thought this logic of identity has created a vast number of such mutually exclusive oppositions that structure whole philosophies: subject/object, mind/body, nature/culture. These dichotomies in Western discourse are structured by the dichotomy good/bad, pure/impure. The first side of the dichotomy is elevated over the second because it designates the unified, the self-identical, whereas the second side

lies outside the unified as the chaotic, unformed, transforming, that always threatens to cross the border and break up the unity of the good."[১৬]

সমাজের ঊর্ধ্বতন মানুষের বুদ্ধিবিচার ও তথাকথিত পুরুষালী গুণযুক্ত ব্যক্তিদের যাপিত অভিজ্ঞতাকে স্বাভাবিক ও নিরপেক্ষরূপে ধার্য করে, প্রান্তিক মানুষের যাপিত অভিজ্ঞতার অবমূল্যায়ন এবং অবহেলা করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় মূলস্রোতের নৈতিক কাঠামোতে। ইয়ং-এর মতে, ধ্রুপদী ন্যায়নীতি তত্ত্বগুলিতে নিরপেক্ষতার ধারণাকে অবাস্তব ও অসম্ভব কিছু কার্যকারিতার মুখোশে আবৃত করে, প্রেক্ষিত বিষয়ক সচেতনতাকে হেয় করা হয়। অথচ এই প্রেক্ষিত বিষয়ে সচেতনতা, যথার্থ নৈতিক তত্ত্বে থাকা অত্যন্ত জরুরী। তথাপি তিনি তাঁর মতাদর্শে উল্লেখ করেন, নিরপেক্ষতার ধারণাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা হলে, নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু অগণতান্ত্রিক পদ্ধতির সম্ভাবনা উন্মুক্ত হবে, যার কোনরূপ নৈতিক বৈধতা থাকবে না। এই আদর্শকে সম্পূর্ণ বাতিল করলে সমাজের যৌথ ক্রিয়ার ক্ষেত্রে গ্রহণ করা নৈতিক সিদ্ধান্তের বৈধতা বজায় রাখা দুরূহ হয়ে পড়বে। তাঁর মতে, ধ্রুপদী নীতিতত্ত্বে নিরপেক্ষতার আদর্শের ভিত্তিতে যেরূপ আকারগত প্রাকল্পিক তত্ত্ব গঠন করা হয়েছে সেরূপ কাল্পনিক চুক্তি না করে, এমন একটি নৈতিক কাঠামো প্রস্তুত করতে হবে, যেখানে বাস্তব জগতের প্রত্যেকেই অংশগ্রহণ করতে পারবে। ইয়ং যে নৈতিক পরিকাঠামোর উল্লেখ করেছেন সেখানে, একই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত প্রত্যেক স্বতন্ত্র ব্যক্তির স্বরের ভিন্নতাকে মর্যাদা দেওয়া হবে।

কিন্তু নীতিতত্ত্বকে কেবল আকারগতরূপে প্রতিষ্ঠা করা হলে সেক্ষেত্রে একটি সীমাবদ্ধতা চলে আসবে। মূলস্রোতের ন্যায়নীতির তত্ত্বগুলিতে প্রেক্ষিতকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়, যাতে সাপেক্ষতার কোন মূল্যই থাকে না। অধিকাংশ নারীবাদীর সঙ্গে সহমত হয়ে ইয়ং বলেন –

[১৬] Young, Iris Marion." 1990, p. 99.

নিরপেক্ষতার ধারণার মাধ্যমে মানবতার আদর্শ ধর্মকে নির্দিষ্ট করার অর্থ হল– মানুষের নৈতিক চিন্তনের পরিধিকে একটি নির্দিষ্ট গন্ডীতে সীমাবদ্ধ করে রাখা। নীতিতত্ত্বের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু সামান্য ন্যায়নীতি নির্ধারণের মাধ্যমে ন্যায্যতার মানদন্ড প্রতিষ্ঠা করার অর্থ হল, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের প্রেক্ষিতের বা পরিস্থিতির বিভিন্নতাকে অদৃশ্য করে বা অগ্রাহ্য করে এমন একটি নৈতিক প্রকল্প গঠন করা, যেখানে মানুষের সামাজিক জীবন তাৎপর্যহীন হয়ে পরে। এই প্রসঙ্গে তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন যে মূলস্রোতের এই আদর্শনিষ্ঠ বৌদ্ধিকতা এবং নৈতিক বোধের সঙ্গে মানুষের সাধারণ কামনা-বাসনা, আবেগ অনুভূতিগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। কারণ আমাদের মূর্ত চিন্তনের ফলস্বরূপ এই আবেগ অনুভূতিগুলির ব্যাখ্যা, বিমূর্ত নৈতিক বোধের দ্বারা সম্ভবপর নয়। আদর্শনিষ্ঠ চিন্তন অনুসারে, কোন ব্যক্তি যখন নিরপেক্ষ, সভ্য বুদ্ধির অধিকারী হবে, তখন সে ব্যক্তিগত বাসনা, আকাঙ্খা, তৃপ্তি প্রভৃতির ঊর্ধ্বে গিয়ে নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ হতে পারবে। মূলস্রোতের উক্তপ্রকার নৈতিকতা বর্হিজগতকে প্রাধান্য দিয়ে, ন্যায্যতা (justice) প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করে। সেইস্থলে পুরুষ-প্রধান কারণ সে বৌদ্ধিক ও নিরপেক্ষ। আর আপাতদৃষ্টিতে যেটি নারীর বিচরণস্থল সেই অন্দরমহল বা ব্যক্তির নিজের জগতকে, ন্যায়নিষ্ঠ ন্যায্যতার পরিকাঠামোর অন্তর্ভূক্তই করা হয় না। তাঁর মতে, বাহ্যিক এবং ব্যক্তিগত জগতের মধ্যে আন্তর্সম্পর্ক বর্তমান, সুতরাং এই দুই জগতের মধ্যে এরূপ বিভাজন অপ্রয়োজনীয় ও নিরর্থক। ইয়ং মনে করেন-

> “The ideal of impartiality expresses in fact an impossibility, a fiction. No one can adopt a point of view that is completely impersonal and dispassionate, completely separated from any particular context and commitments.” [১৭]

[১৭] Young, Iris Marion. 1990, p. 103.

এইরূপ পক্ষপাতরাহিত্যের আদর্শটি অবাস্তব। কারণ ব্যক্তির পক্ষে সামগ্রিকরূপে নৈর্ব্যক্তিক, প্রেক্ষিত-বিবর্জিত অবস্থান অবলম্বনপূর্বক সকল প্রকার ব্যক্তিগত অঙ্গীকার, প্রেক্ষিতের নির্দিষ্টতাকে উপেক্ষা করা অসম্ভব। নারীবাদীরা যে প্রকার নৈতিক ধারণা বা পদ্ধতির প্রস্তাব দেন সেক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা, বিমূর্ততার পরিবর্তে, বিভিন্ন দেশ–কালস্থিত নারীর নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী, যাপন অভিজ্ঞতা, প্রেক্ষিত, ব্যক্তির মনন তথা মূর্ত চিন্তন প্রাধান্য পায়। এক্ষেত্রে নারীবাদীরা প্রত্যেক নারীর ভাবনার সামান্যীকরণ বা সার্বিকীকরণ দাবী করেন না। তাঁরা নারীর বিচিত্র বিভিন্ন নৈতিক চিন্তন, অনুভূতি, বোধ ও আবেগকে মর্যাদা দিয়ে, সম্পর্কের নিরিখে ধারণা বা আদর্শগুলির পুনর্গঠন করার কথা বলেন। এঁরা সমরূপিতার পরিবর্তে বিষমরূপিতাকে স্বীকৃতি দিয়ে বিকল্প নৈতিক অবস্থান গড়ে তুলতে আগ্রহী।

এই প্রসঙ্গে অপর একজন নারীবাদী নীতিতাত্ত্বিক এলিজাবেথ কিস্‌ের বক্তব্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। কিস্‌ের মতে-

> "In some contexts attempts to be impartial are not only benign but obligatory. It is appropriate, for instance, to try to be impartial to gender when deciding how to rotate leadership positions within a group, in critiquing someone's work, such as a paper, symphony, or scientific theory, in opening a door for someone, or in evaluating someone's cruel or abusive action." [১৮]

কিস্‌ মনে করেন, নৈতিক পরিসরে পক্ষপাতরাহিত্যের আদর্শটিকে অস্বীকার করা দার্শনিকতার প্রেক্ষাপটে যুক্তিসঙ্গত নয়। তাঁর অভিমত পক্ষপাতশূন্য হওয়ার প্রসঙ্গে ব্যক্তির একটি দায়বদ্ধতা থাকা উচিত। এক্ষেত্রে কোন গোষ্ঠীর দল-প্রদান নির্বাচন করার ক্ষেত্রে

---

[১৮] Kiss, Elizabeth. "Justice." *A Companion to Feminist Philosophy*, eds. Alison M. Jaggar and Iris Marion Young, Blackwell Publishers Ltd., Oxford, 2000, p. 495.

প্রত্যেকের পক্ষপাতরহিত থাকার চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, একজন পরীক্ষকের উত্তর পত্রের মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে বা কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সমালোচনা করার ক্ষেত্রে পক্ষপাতরহিত অবস্থান গ্রহণ করাই কাম্য। এমনকি যেকোন নৃশংস আচরণকেও লিঙ্গ নির্বিশেষে অনৈতিক হিসাবে চিহ্নিত করাই অভিপ্রেত বলে কিস্ মনে করেছেন। যদি কোন ক্ষেত্রে স্বজনপোষণ হয় তবে সেক্ষেত্রে নিরপেক্ষ বিচারের দাবি করাই স্বাভাবিক এবং সঠিক। সুতরাং কিসের ব্যাখ্যায়, পক্ষপাতরাহিত্যের আদর্শকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করলে ন্যায় প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাও ত্যাগ করতে হবে।

কিসের মতে, নারীবাদী নৈতিক কাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রেও বিমূর্তীকরণ প্রয়োজন আছে। তত্ত্ব মাত্রই বিমূর্তীকরণ দ্বারা গ্রথিত, নারীবাদী তত্ত্বও তার ব্যতিক্রম নয়। দরদী নীতিবীক্ষায় অনৈতিক সমৃদ্ধ প্রকৃতির কথা বললেও, কিছু নীতি পরিহার করে চললেও, সমস্ত নীতি পরিহার্য একথা বলা যায় না। আপাতদৃষ্টিতে এক্ষেত্রে কোন নীতি নেই বলে মনে হলেও, দরদী নীতিশাস্ত্র মূলত নৈতিক কর্তার সম্পর্কস্থিত পারস্পরিক নির্ভরতার স্বীকারোক্তি, মনোযোগ, ব্যক্তি ও অপরের প্রতি দরদের পরিচালনা, শ্রদ্ধা নির্মিতা,পূর্ণতা ইত্যাদি সামর্থ্যগুলির উন্নতিসাধন, ন্যায়পরায়ণ এবং দরদী সম্পর্কগুলির উৎকর্ষতা বজায় রাখা প্রভৃতি বিষয়গুলিকে ঘিরে আবর্তিত হয়। কিস্ নিরপেক্ষতার আদর্শটিকে অস্বীকার না করলেও ধ্রুপদী মতাদর্শীদের মতো অন্ধ সমর্থক নন। তিনি মনে করেন, বিমূর্তীকরণের আধিক্যের জন্য চিরয়ত নৈতিকতায় নারীর প্রতি একটি দীর্ঘ অনবধান হয়েছে। সুতরাং সংশোধিত ন্যায়ের শাস্ত্রে অপরের জীবনের মূর্ততার প্রতি বিশেষরূপে মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন।[১৯]

কিসের মতে, মানুষের বৌদ্ধিক নীতি গঠনের ক্ষমতার মতোই অপরের সাথে সম্পর্কিত সংবেদনশীল হওয়া, অনুভূতিশীল হওয়া অপরের অবস্থা বোঝার সামর্থ্যও মানব সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরী। ধ্রুপদী নীতিতত্ত্বে, বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন, স্বতন্ত্র, স্বাস্থ্যবান, পরিণত

[১৯] Kiss, Elizabeth. 2000, pp. 495-9.

মানবকে সূত্রস্থলরূপে বিবেচনা করা হয়। অথচ নির্ভরতা, পারস্পরিক আদান প্রদান, সম্পর্কিত থাকা পরমুখাপেক্ষিতা, শারীরিক অসামর্থ্যতা- প্রভৃতি মানব জীবনের সাধারণ এবং মৌলিক বৈশিষ্ট্য। সুতরাং নৈতিকতার প্রেক্ষিতে এই বিষয়গুলিকে অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। বিমূর্ততার প্রতি মাত্রাতিরিক্ত মূল্যদানের অর্থ হল, মানব জীবনের বৈচিত্রতা ও অভিজ্ঞতাগুলির নৈতিক প্রাসঙ্গিকতাকে অবহেলা করা। তাই কিস্ মনে করেন, যথার্থ নৈতিক প্রকল্পে, নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে 'Bottom up approach' নেওয়া প্রয়োজন।[২০] তিনি পরিস্থিতিসাপেক্ষ ন্যায়নীতির ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। কোন নৈতিক তত্ত্ব গঠনের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা, বিমূর্ততার প্রয়োজনীয়তাকে কিস্ সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেননি। তবে তিনি মনে করেন নীতিতত্ত্বে সাম্যের খাতিরে ও বৈষম্যকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে, যারা সমাজে ক্ষমতাশালী বা সুবিধাভোগী নন, সেইরূপ প্রান্তিক যাপন অভিজ্ঞতার বিশেষ গুরুত্ব থাকা আবশ্যক।

গোড়ার দিকে নারীবাদকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়, নরমপন্থী (Liberal) ও চরমপন্থী (Radical)। প্রথম মত অনুসারে, নীতিতত্ত্বকে লিঙ্গ-বর্জিত রূপ দেওয়া যেতে পারে, অর্থাৎ লিঙ্গ-নিরপেক্ষ নীতিতত্ত্ব সম্ভব। কিন্তু দ্বিতীয় মতে, কোন তত্ত্ব কাঠামোই লিঙ্গ-অনপেক্ষ নয়। সুতরাং প্রতিষ্ঠিত সকল ধ্রুপদী তত্ত্ব কাঠামোই পরিহারযোগ্য, যেহেতু সেগুলির দ্বারা নারীবাদ চিহ্নিত বা সূচিত সমস্যাগুলির সমাধান সম্ভব নয়। চরমপন্থী মত অবলম্বন করে যাঁরা দরদী নৈতিকতার কথা বলেছেন, তাঁরা লিঙ্গ-সাপেক্ষ তত্ত্ব কাঠামো গঠনে উদ্যোগী হয়েছেন। একথা বলা যেতেই পারে, পাশ্চাত্য ধ্রুপদী বুদ্ধিবাদী দার্শনিক তত্ত্বগুলি, বিশেষত কান্ট ও রলসের নীতিশাস্ত্র দরদী নৈতিকতার পূর্বপক্ষ। এই গবেষণা পত্রের পরবর্তী অধ্যায়ে দরদী নৈতিকতার আঙ্গিকে, পক্ষপাতরাহিত্য বিষয়ে একটি বিচারমূলক আলোচনা করা হয়েছে।

---

[২০] Kiss, Elizabeth. 2000, pp. 493.

তৃতীয় অধ্যায়

নারীবাদী নীতিবিদ্যার আঙ্গিকে কান্ট ও রলসের তত্ত্বের পুনর্পাঠ

যেসকল নারীবাদী দার্শনিক দরদী নীতিশাস্ত্রকে, ধ্রুপদী নীতিতত্ত্ব সমূহ যথা- কর্তব্যবাদ, উপযোগবাদ প্রভৃতির একটি দৃঢ় এবং বিকল্প সম্ভাবনারূপে ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন- ভার্জিনিয়া হেল্ড। হেল্ড দরদকে মূল্য এবং চর্চা এই উভয় অর্থেই বুঝতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, দরদ একটি সদ গুণ এবং এটির অনুশীলন করা জরুরী। দরদী নীতিবিদ্যায়, নৈতিক আবেগ যথা- সহানুভূতি, সহমর্মিতা সংবেদনশীলতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা প্রভৃতি গুলির যথার্থ মূল্য রয়েছে। ভার্জিনিয়া হেল্ড তাঁর *The Ethics of Care : Personal, Political and Global* -গ্রন্থে উল্লেখ করেন,

> "The ethics of care stresses the moral force of the responsibility to respond to the needs of the dependent." [১]

হেল্ড ব্যাখ্যা করেন, দরদী নীতিশাস্ত্র পরিবার এবং বন্ধুদের প্রতি যথার্থ আচরণ বিষয়ে পথ প্রদর্শন করে থাকে। কিন্তু তিনি মনে করেন ধ্রুপদী পক্ষপাতরহিত নীতিতত্ত্বগুলি, বিশেষত কান্টের নিরপেক্ষ নীতিতত্ত্ব আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সাপেক্ষতাকে ব্যাখ্যা করতে অসমর্থ। দরদী নীতিবীক্ষায় ব্যক্তির পরিজন-বান্ধবের প্রতি তার দরদী আচরণকে নৈতিকতার প্রেক্ষিতে মূল্য দেওয়া হয়, অথচ কান্টীয় নীতিতত্ত্বে উক্তপ্রকার ক্রিয়ার কোন নৈতিক মূল্য নেই, কারণ কান্ট সর্বদা পক্ষপাতরাহিত্যের দাবি করেছেন। হেল্ড মনে করেন তথাকথিত পক্ষপাতরহিত নৈতিক তত্ত্বগুলি যথা- কান্ট, রলসের নীতিতত্ত্বগুলি অপর্যাপ্ত। কারণ এই সকল তত্ত্বে বিমূর্ততা এবং নিরপেক্ষতাকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে, ব্যক্তির জীবনের মূর্ত

---

[১] Held, Virginia. *The Ethics of Care: Personal, Political, and Global*, Oxford University Press, 2006, p. 10.

পরিস্থিতিকে অগ্রাহ্য করা হয়। উক্তপ্রকার তত্ত্বগুলি প্রত্যেক মানুষের নির্দিষ্ট পরিস্থিতিসাপেক্ষ সমস্যার প্রতি অবিদিত, অর্থাৎ এক্ষেত্রে নৈতিকতার প্রেক্ষিতে, নির্দিষ্ট ব্যক্তির মূর্ত ও বিশেষ পরিস্থিতিসাপেক্ষ সমস্যাগুলিকে বিবেচনা করা হয় না। সুতরাং হেল্ডের মতে, আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের সাথে সংযুক্ত সাপেক্ষ পরিস্থিতিগুলির বিচার করার ক্ষেত্রে, কান্টের তত্ত্বের ন্যায় পক্ষপাতরহিত মূলস্রোতের নীতিতত্ত্বগুলি অপর্যাপ্ত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কান্ট অনুগামী দার্শনিক মারসিয়া ব্যারন, ভার্জিনিয়া হেল্ডের এই প্রকার দাবিকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হয়েছেন। ব্যারন মনে করেন, নিরপেক্ষ নৈতিক তত্ত্বগুলির দুটি স্তর বা পর্যায় বর্তমান, যথা- উচ্চস্তরের নৈতিকতা এবং নিম্নস্তরের নৈতিকতা। উচ্চস্তরের নৈতিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু নিম্নস্তরের নৈতিকতার ক্ষেত্রে, সাপেক্ষতাকে অস্বীকার করার প্রয়োজন নেই। অতএব ব্যারনের মতে, নিম্নস্তরের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা অপ্রয়োজনীয়। নিম্নস্তরের নৈতিকতা বলতে তিনি বুঝিয়েছেন স্বতন্ত্র ক্রিয়াকে (individual actions)। সুতরাং কোন নিরপেক্ষ নৈতিক তত্ত্বকে অনুসরণ করলেও ব্যক্তি তার স্বতন্ত্র ক্রিয়ার ক্ষেত্রে সাপেক্ষ আচরণ করতেই পারে, অর্থাৎ সে তার পরিবার এবং বন্ধুদের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ করতেই পারে। পক্ষপাতরহিত নীতিতত্ত্বগুলিতেও নিম্নস্তরের নৈতিকতা অর্থাৎ ব্যক্তির স্বতন্ত্র, ব্যক্তিগত কর্মের ক্ষেত্রে সাপেক্ষতার স্থান স্বীকৃত হয়েছে বলে ব্যারন মনে করেন। সমাজের উচ্চস্তরের নৈতিকতা বলতে তিনি বুঝিয়েছেন নৈতিক নীতি গঠন এবং পালনকে। যথার্থ নৈতিক নীতি গঠন এবং যথাযথভাবে সেগুলির পালনের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা কাম্য। কিন্তু ব্যক্তিগত কার্যের ক্ষেত্রে, নিজের পরিবার বা বন্ধুর প্রতি নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে, সাপেক্ষতাকে জায়গা দেওয়াই যায়।[২]

---

[২] Bramer, Marilea. "The Importance of Personal Relationships in Kantian Moral Theory: A Reply to Care Ethics." *Hypatia* 25.1, 2010, pp. 121-122.

কিন্তু হেল্ড, ব্যারনের উক্তপ্রকার ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করেছেন। কারণ হেল্ডের মতে এইরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা নৈতিক ক্ষেত্রে সৃষ্টি হওয়া কিছু কিছু দ্বন্দ্ব নিরসন অসম্ভব, যথা- একাধারে নিরপেক্ষ নৈতিক বিধি পালনের প্রতি দায়বদ্ধতা, অপর দিকে প্রিয়জনের প্রতি দরদী আচরণের অভিপ্রায় বা বাসনা- উভয়ের মধ্যে যদি বিরোধ সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ সেই পরিস্থিতিতে কোন ক্রিয়াটি করা বাঞ্ছনীয় এরূপ দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলে, সেটি নিরসনের উপায় ব্যারনের ব্যাখ্যায় অস্পষ্ট। তাই ভার্জিনিয়া হেল্ড দাবি করেন, যদি আমাদের নীতিতত্ত্বগুলিতে নিরপেক্ষ নীতি প্রাধান্য পায়, তাহলে ব্যক্তিকে যাপিত জগতেও সেই নিরপেক্ষতার দ্বারাই চালিত হতে হবে। নৈতিক নীতির ক্ষেত্রে অনপেক্ষতাকে প্রতিষ্ঠা করা হলে, ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও সেই অনপেক্ষতাকে বজায় রাখতে হবে, সেইক্ষেত্রে সাপেক্ষতাকে স্থান দেওয়া যাবে না। নিরপেক্ষতার দ্বারা উচ্চস্তরের ন্যায্যতার নীতি নির্ধারণ করার অর্থ, নিম্নস্তরের নৈতিকতাতেও অনপেক্ষতাকে প্রতিষ্ঠা করা।

অধিকাংশ দার্শনিকগণ কান্টের নীতিতত্ত্বকে নিরপেক্ষ তত্ত্ব হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। ‘পক্ষপাতরাহিত্য’ বলতে বোঝানো হয়, প্রত্যেকের প্রতি সমান আচরণ করা এবং প্রত্যেককে সমান বিবেচনা করে গুরুত্ব দেওয়া। নিরপেক্ষ নীতিতত্ত্বের সমালোচকদের বক্তব্য হল, এইরূপ তত্ত্বগুলি আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের প্রতিবন্ধক। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পর্কের নিবিড়তা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়। আর যদিও বা ব্যক্তিগত সম্পর্ককে অনুমোদন দেওয়া হয়, কিন্তু সেই সম্পর্কের ক্ষেত্রে যেন ব্যক্তি কোনভাবেই অধিক হিতসাধক বা লাভ জনক আচরণ না করে, সেই দিকে সতর্ক করা হয় বারংবার। কান্টীয় নীতিতত্ত্ব এবং দরদী নীতিতত্ত্বের উক্ত প্রকার দ্বন্দ্ব এবং ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর উপর আলোকপাত করার উদ্দেশ্যে হেল্ড একটি উদাহরণের উল্লেখ করেন। ধরা যাক্, একজন বিশেষ দক্ষতা বা গুণসম্পন্ন পেশাগতভাবে শিক্ষক ব্যক্তি যিনি আবার একটি শিশুর পিতাও, তিনি বিশেষ রূপে সক্ষম শিশুদের অর্থাৎ যেসব শিশুদের

অধিক যত্ন প্রয়োজন তাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে সাহায্য করে থাকেন। এক্ষেত্রে ব্যক্তির পিতারূপে তার সন্তানের প্রতিও কিছু দায়বদ্ধতা রয়েছে, আবার সমাজে শিক্ষক হিসেবে বিশেষরূপে সক্ষম শিশুদের প্রতি অধিক মনোযোগ জ্ঞাপন করাও তার কর্তব্য। এমতাবস্থায় তার কোনটি করণীয় তা নিয়ে ব্যক্তিমনে দ্বন্দ্বের উদ্রেক হতে পারে, অর্থাৎ নিজের সন্তানের সঙ্গে বেশী সময় অতিবায়িত করা নাকি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অধিক শ্রম বা সময় ব্যয় করা- কোন্ ক্রিয়াটি তার জন্য উপযুক্ত এই বিষয়ে সংশয় দেখা যায়।

এইরূপ পরিস্থিতিতে হেল্ড মনে করেছেন, উক্ত ব্যক্তিটি যদি কান্টের নীতিতত্ত্বের অন্তর্নিহিত নিরপেক্ষ বৌদ্ধিকতাকে ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে নিশ্চিতরূপে তিনি তার ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে অধিক সময় ব্যয় করাকে সঠিক বলে বিচার করবেন।

কান্টের নীতিতত্ত্বে স্পষ্টত নিরপেক্ষ ভাবে ন্যায়নীতি অনুসারে কর্ম করার কথা বলা হয়েছে। এইপ্রকার ন্যায়নীতিগুলি ব্যক্তিকে পরামর্শ দেয়, প্রত্যেকের প্রতি সমান আচরণ করতে। এমনকি এক্ষেত্রে, নিজের সন্তানের প্রতিও কোনরূপ বিশেষ আচরণ বা অধিক গুরুত্ব আরোপ করা অনুমোদনযোগ্য নয়। যদি কোন ব্যক্তির, পেশাগত দিকে বিশেষ কোন দক্ষতা থাকে, তাহলে তার উচিত হবে সেই দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে প্রত্যেকের প্রতি সমানভাবে উপকার বা সাহায্য করা। যথা- একজন শিক্ষক নিজের সন্তানের প্রতি কোনরূপ অতিরিক্ত আনুকূল্য (favour) দেখাতে পারেন না, যদি সেই সন্তানটি ব্যক্তির ছাত্রদের মধ্যেই একজন হয়। সুতরাং হেল্ডের মতে, কান্টীয় নীতিতত্ত্ব অনুসরণ করলে উক্ত ব্যক্তির কাছে নিজের সন্তানের তুলনায়, ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে বেশী সময় অতিবাহিত করাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ হবে।[৩]

[৩] Held, Virginia. 2006, pp. 97-99.

একদিকে, নিরপেক্ষ নীতিতত্ত্বগুলির প্রারম্ভ হয়েছে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। অপরদিকে, দরদী নীতিবিদ্যা গড়ে উঠেছে দরদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। জন ট্রন্টো মনে করেন, দরদী নীতিবিদ্যার কেন্দ্রীয় নৈতিক প্রশ্ন এটি নয় যে, অপরের প্রতি আমাদের কি দায়বদ্ধতা রয়েছে? বা অপরকে আমাদের কি দেওয়ার আছে? বরং মূল প্রশ্নটি হল, আমাদের দরদী দায়িত্ববোধকে আমরা যথার্থভাবে পালন করব কিভাবে?[৪] এই প্রসঙ্গে নডিংস্ বলেছেন, প্রায় প্রত্যেকেই আমরা কোন না কোনভাবে, কখনো না কখনো অপরের দরদী আচরণের দ্বারা উপকৃত হয়ে থাকি। এটি অবশ্য স্বীকার্য যে দরদের একটি মৌলিক এবং অপরিহার্য মূল্য বর্তমান। প্রত্যেকের বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রেই কোন না কোন ব্যক্তির দরদী মনোভাব বা আচরণের অবদান নিশ্চিতরূপে উপস্থিত।[৫]

হেল্ড বলেন-

> "Ethics of Care starts with the moral claims of particular others, for instance, of one's child, whose claims can be compelling regardless of universal principles" [৬]

দরদী নীতিবিদ্যার সূচনা হয়, নির্দিষ্ট বা বিশেষ অপরের নৈতিক দাবি থেকে। যথা- নিজের সন্তানের দাবি-দাওয়াকে মেনে নেওয়া, সার্বিক ন্যায়নীতি নির্বিশেষে বাধ্যতামূলক। ব্যক্তির ক্রিয়ার বা কার্যের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করার জন্য, কোন সার্বিক ন্যায়নীতির আবশ্যকতা নেই। বরং এক্ষেত্রে লক্ষণীয় হওয়া উচিত, কোন্ অপরের প্রয়োজন বা চাহিদা

---

[৪] Tronto, Joan. *Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care,* New York: Routledge, 1993, p. 137.

[৫] Noddings, Nel. *Caring: A Feminine Approach of Ethics and Moral Education,* 2nd ed. Berkeley: University of California Press, 2003, p. 5.

[৬] Held, Virginia. 2006, p. 10.

অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যত্নশীল আচরণ করার ক্ষেত্রে এবং অপরের প্রতি মরমী মনোভাবাপন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে, কোন নিরপেক্ষ নৈতিক নিয়মের অনিবার্যতা থাকে না। এক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় অপরের প্রতি উদ্বেগের, প্রয়োজন হয় অপরের সমস্যা-প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিয়ে উপলব্ধি করার।[৭] সুতরাং দরদী নীতিবীক্ষায়, নিরপেক্ষ ন্যায়নীতির দ্বারা চালিত হওয়ার পরিবর্তে, অপরের প্রয়োজনীয়তা এবং উদ্বেগকে মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ করে, কার্য সম্পাদন করার কথা বলা হয়।

এবারে হেল্ড মনে করছেন, উক্ত শিক্ষক পিতার পরিস্থিতির উদাহরণটিকে যদি, দরদী নীতিতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পর্যালোচনা করা হয়, তাহলে একটি ভিন্ন সমাধান আসবে। উক্তপ্রকার দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, একজন পিতার সঙ্গে তার সন্তানের সম্পর্ক অমূল্য। এই সম্পর্কের একটি বৃহৎ এবং অপূরণীয় মূল্য বর্তমান। সন্তানের প্রতি উদ্বেগ বা চিন্তার কারণেই, সেই পিতা তার সন্তানের সহিত অধিক সময় ব্যয় করতে আগ্রহী হতে পারেন। পিতা-সন্তানের সম্পর্কের অন্তর্গত ভালোবাসা, আস্থা, আনুগত্য, বিশ্বাস প্রভৃতিগুলি উপলব্ধি করার পর, সেই ব্যক্তির মনে হতে পারে তিনি অপর কোনো প্রকার বিবেচনার অধীনস্থ না হয়ে, যথা- তার পেশাগত দক্ষতাগুলি অভ্যাস করার পরিবর্তে, তিনি তার সন্তানের জন্য পর্যাপ্ত সময় অতিবাহিত করবেন। পেশাক্ষেত্রের অতিরিক্ত ক্রিয়াগুলি থেকে নিজেকে বিরত রেখে, সন্তানকে বিশ্বাস, আস্থা, উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা যোগাতে সাহায্য করবেন, যাতে সেই সন্তানের একজন যথার্থ বা ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার পথটি সুগম ও মসৃণ হয়। যদিও এক্ষেত্রে নিরপেক্ষ নৈতিকতার সাথে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়, তথাপি এইরূপ ক্রিয়াকে নৈতিকভাবে ভুল কখনোই বলা যায়না।[৮]

---

[৭] Tronto, Joan. 1993, p. 105.

[৮] Held, Virginia. 2006, p. 99.

কোন ব্যক্তি যদি সকলকে সমানভাবে উপকার করার পরিবর্তে, স্বপরিবার এবং বান্ধব পরিজনের উপকার করাকে বেছে নেন, তাহলে সেটি দরদী নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে সমস্যাজনক নয়। কিন্তু হেল্ড মনে করেন, কান্টের নীতিতত্ত্বের ন্যায় নিরপেক্ষ নীতিতত্ত্বগুলিতে, নৈতিক প্রেক্ষিতে ব্যক্তির পরিবার এবং বন্ধুবান্ধবের প্রতি অধিক বা বিশেষ মনোযোগ, উদ্বেগ প্রকাশ করা অনুমোদনযোগ্য নয়। কান্টীয় নীতিতত্ত্বে নৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে, কর্তার নিজস্ব ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং প্রসঙ্গকে প্রাধান্য না দেওয়া কথা বলা হয়। ফলস্বরূপ নৈতিক কর্তার থেকে প্রত্যাশিত হয়, নিজস্ব পরিবার, সন্তান, বান্ধব নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের প্রতি সমান ব্যবহার। কান্টের নীতিদর্শনের এইরূপ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির হেল্ড সহ অন্যান্য দরদী নীতিদার্শনিকরা বিরোধিতা করেন।

এইপ্রসঙ্গে মারিলিয়া ব্রামের মনে করেন, হেল্ড সহ অন্যান্য দরদী নীতিবিদদের, কান্টের নীতিতত্ত্ব সম্পর্কে উক্ত প্রকার দাবি ভ্রান্ত। হেল্ডের মতে, কান্টের নীতিতত্ত্ব অনুসারে, নৈতিক কর্তাকে প্রত্যেকের প্রতি সমআচরণ করতে হবে। নিকট সম্পর্ক যথা- পরিবার, আত্মীয়, বান্ধব প্রভৃতির প্রতি কোনরূপ বিশেষ বা পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গী রাখা যাবে না। কিন্তু ব্রামের বলেছেন, কান্টের নীতিতত্ত্ব সম্পর্কিত নারীবাদীদের এইপ্রকার ব্যাখ্যাটি আদপে কান্টের নীতিতত্ত্ব সম্পর্কিত একটি ভ্রান্ত ধারণা। তিনি আরো বলেন, দরদী নীতিবিদদের দিক থেকে একটি প্রশ্নের উত্থাপন বারংবার হয়েছে, সেটি হল- কোন ব্যক্তি যখন তার নিকট সম্পর্ক, পরিবার-পরিজন বা বান্ধবদের প্রতি কোনরূপ ক্রিয়া সম্পন্ন করে, দরদী নীতিবিদ্যায় সেইরূপ কর্মের নৈতিক মূল্য বর্তমান। কিন্তু এখন প্রশ্ন হল, কান্টীয় নীতিতত্ত্বে কি উক্তপ্রকার কার্যগুলির নৈতিক মূল্য বর্তমান? এইরূপ ক্রিয়াগুলি কি আদৌ, নিরপেক্ষ নীতিতত্ত্বগুলিতে নৈতিকভাবে অনুমোদনযোগ্য বা গ্রহণযোগ্য হয়? ব্রামের, দরদী নীতিবিদদের এইপ্রকার প্রশ্নের উত্তর দিতে সচেষ্ট হন। তিনি মনে করেন, কান্টের নীতিতত্ত্বে উক্তপ্রকার ব্যক্তিগত কার্যগুলিকে, কেবলমাত্র

অনুমোদনযোগ্য বলেই ধার্য করা হয় এমন নয়, উপরন্তু এইক্ষেত্রে নৈতিকতার প্রেক্ষিতে পরিবার এবং বন্ধুদের বিশেষভাবে বিবেচনা করার প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করা হয়। তাঁর মতে, এইরূপ কর্মগুলি শুধুমাত্র নৈতিকভাবে অনুমোদনযোগ্যই নয়, এমনকি তাদের নৈতিক মূল্যও বর্তমান।

হেল্ড মনে করেছেন, কান্টের নীতিতত্ত্ব দাবি করে, একজন যথার্থ নৈতিক কর্তাকে, প্রত্যেকের প্রতি সমভাবাপন্ন হতে হবে। এমনকি নিজের সন্তানের প্রতিও কোনরূপ বিশেষ আচরণ করা যাবে না। হেল্ডের এই মতকে বাতিল করে ব্রামের, এই প্রসঙ্গে মারসিয়া ব্যারনের বক্তব্যকে তুলে ধরেন।[৯] ব্যারন এক্ষেত্রে ভিন্ন মতামত পোষণ করেন। তিনি হেল্ডের উক্তপ্রকার দাবির নিরিখে বলেছেন, এটা কখনোই সকল প্রেক্ষিতনিরপেক্ষ নীতিতত্ত্বগুলির আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য হতে পারে না।

ব্যারনের মতে, নিরপেক্ষ নীতিতত্ত্বগুলিকে, নিদেনপক্ষে কান্টীয় নীতিতত্ত্বকে যথাযথ অর্থে বুঝতে হলে, দুটি পর্যায়ে বা স্তরে গঠিত নিরপেক্ষতাকে বুঝতে হবে। তিনি আরো বলেন, কান্টীয় নীতিতত্ত্ব, যে পর্যায়ে সাধারণ ন্যায়নীতিগুলির নির্বাচন হয়, সেই পর্যায়ে নিরপেক্ষতা দাবি করে। কিন্তু ব্যক্তির সরাসরি কার্যসমূহের (direct actions) ক্ষেত্রে এই নিরপেক্ষতা অপরিহার্যরূপে প্রয়োজনীয় নয়। যেসকল পরিস্থিতিগুলিতে সাধারণ ন্যায়নীতি, সাপেক্ষতাকে অনুমোদন দেয়, কেবলমাত্র সেইসকল ক্ষেত্রে আমরা সাপেক্ষ আচরণ করতে পারি। নিজের মাতা-পিতাকে শ্রদ্ধা করা এবং তাদের প্রতি বিশেষ সাপেক্ষ আচরণ করা যেতেই পারে। কারণ "মাতা-পিতাকে শ্রদ্ধা করা উচিত"- এইরূপ সাধারণ ন্যায়নীতিকে অনুসরণ করা যথার্থ বলেই মনে করা হয়। মাতা-পিতার প্রতি সাপেক্ষতা অবলম্বন করে, তাদের অধিক মর্যাদা জ্ঞাপন

[৯] Bramer, Marilea. 2010, pp. 124-25.

করাকে, সাধারণ ন্যায়নীতি সমর্থন করে। কান্টীয় নীতিতত্ত্বে, পক্ষপাতরাহিত্য ব্যক্তির কৃত কর্মের একটি পথপ্রদর্শক নীতি হিসেবে কাজ করে। কিন্তু এর অর্থ এমন নয় যে, কোন্ কাজটি সঠিক, সেটি নির্বাচনের ক্ষেত্রেও নিরপেক্ষতা অপরিহার্য। নিরপেক্ষতার আবশ্যকতা রয়েছে কেবলমাত্র, সাধারণ ন্যায়নীতি (General principles) নির্ধারণের ক্ষেত্রে।[১০]

হেল্ড মনে করেন, ব্যারনের উক্তপ্রকার বক্তব্যটি অপর্যাপ্ত। কারণ নিরপেক্ষতাকে দুটি পর্যায়ে বা স্তরে বিভক্ত করলেও, সম্পর্কের যথার্থ অবস্থান বিষয়ক প্রশ্নের সমাধান পাওয়া যায় না। এরূপ প্রশ্নের উত্তর কিন্তু অজানাই থেকে যায়। কান্ট তথা নিরপেক্ষতাবাদীদের জন্য, নিজের পিতাকে শ্রদ্ধা করার কারণ হলো, প্রত্যেক সন্তানের কর্তব্য তার মাতাপিতাকে সম্মান করা। অপরদিকে, সাপেক্ষতাবাদী তথা দরদী নীতিবিদগণ মনে করেন, একজন সন্তান তার মাতাপিতাকে শ্রদ্ধা করে কারণ, ব্যক্তির ছোট থেকে বেড়ে ওঠার পেছনে তার মাতাপিতার অজস্র, অনস্বীকার্য অবদান উপস্থিত। এক্ষেত্রে অপর কোন সন্তান তার পিতাকে সম্মান করে কিনা, এই বিষয়টি সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। ব্যক্তির তার মাতাপিতাকে শ্রদ্ধা করা বা না করার ভিত্তি হবে, কেবলমাত্র তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক। ধরা যাক্, কোন মাতাপিতা যদি তাদের সন্তানের প্রতি অবমাননাকর আচরণ করে থাকেন দিনের পর দিন, তাকে অবহেলা ও বঞ্চনা করে থাকেন, তাহলে সেক্ষেত্রে এরূপ তিক্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে কখনোই, সন্তানের কাছ থেকে তার মাতা-পিতার প্রতি শ্রদ্ধাপূর্বক আচরণ আশা করা যায় না। এক্ষেত্রে দুটি ব্যক্তির পারস্পরিক নির্দিষ্ট সম্পর্কের প্রতি মূল আলোকপাত করতে হবে। সুতরাং দরদী নীতিবিদ্যায়, ন্যায়নীতিকে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু না করে, পারস্পরিক সম্পর্ককে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

---

[১০] Baron, Marcia. “Impartiality and friendship.” *Ethics* 101 (4), 1991, pp. 842-43.

হেল্ডের মতে, পক্ষপাতরহিত তত্ত্ব এবং দরদী নীতিতত্ত্বের ক্ষেত্রে দুটি ভিন্ন অবস্থান থেকে তত্ত্বের মূল্যকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই উভয় প্রকার তত্ত্বের মৌলিক পার্থক্যটি হল– দরদী নীতিতত্ত্বের মূল্যের উৎস হল, নির্দিষ্ট ব্যক্তি বিশেষ এবং তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক। অপরদিকে, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবলীর মূল্যের উৎস হল, সাধারণ ন্যায্যতার নীতিসমূহ। সুতরাং হেল্ড, দরদী নীতিবিদ্যার অবস্থান অবলম্বন করে এই প্রসঙ্গে বলেছেন, প্রত্যেক সন্তানের কর্তব্য তার মাতাপিতাকে শ্রদ্ধা করা- এইরূপ সাধারণ ন্যায়নীতির ভিত্তিতে কোন সন্তানের, তার মাতাপিতাকে সম্মান করা কাম্য এবং যথার্থ নয়। এক্ষেত্রে অবশ্যই মাতাপিতা এবং সন্তানের মধ্যের সম্পর্কটি, শ্রদ্ধা করার ভিত্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়।[১১]

সিনথিয়া স্টার্ক (Cynthia Stark), নিরপেক্ষ কান্টীয় নৈতিক তত্ত্ব সম্পর্কে একটি ভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা দেন।[১২] নিরপেক্ষতাকে দুটি পর্যায়ের বিভক্ত না করে স্টার্ক মনে করেছেন, কান্টীয় তত্ত্বের নিরপেক্ষতাকে অন্যভাবে বুঝতে হবে। এই প্রসঙ্গে স্টার্ক- এর বক্তব্য হল কোন্ কার্যটি সঠিক সেটি নির্ধারণ করার পন্থা না দিয়ে কান্টীয় নিরপেক্ষ নীতিতত্ত্ব, ন্যায্যতার ধারণাকে বোঝার একটি যথার্থ মানদন্ড প্রদান করেছে। অর্থাৎ কান্টীয় নীতিতত্ত্বে উল্লিখিত নিরপেক্ষতা, কি ধরনের কাজ করলে সেটি যথার্থ ক্রিয়া হবে, তা নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। কিন্তু নির্দিষ্ট কোন্ ক্রিয়াটি যথার্থ এবং কোনটি অযথার্থ, তার নির্দেশ দেয় না।

ব্যারন-এর মাতাপিতাকে শ্রদ্ধা করার উদাহরণটিকে, স্টার্ক নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করেছেন, "মাতাপিতাকে সর্বদা শ্রদ্ধা করা উচিত" এইরূপ ন্যায়নীতিকে অনিবার্যভাবে পালন করার উপদেশ, কান্টের নিরপেক্ষ নীতিতত্ত্বে দেওয়া হয় না। মাতা-পিতাকে শ্রদ্ধা করা এমন একটি

[১১] Held, Virginia. 2006, p. 99.

[১২] Stark, Cynthia. “Decision Procedures, Standards of Rightness, and Impartiality.” *Nous* 31 (4), 1997, pp. 478-95.

ক্রিয়া, যাকে নৈতিকভাবে যথার্থ বলা হয়। কিন্তু তার অর্থ এমনটা কখনোই নয় যে, সকলকে অনিবার্যভাবে এই নীতি অবলম্বনে সমর্থ হতে হবে। স্টার্ক এটিকে কান্টের নিঃশর্ত অনুজ্ঞার (Categorical imperative) সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তিনি এই প্রসঙ্গে কান্টীয় তত্ত্বের নৈতিকতার সর্বোচ্চ নীতি অর্থাৎ FHE (Formulation of Humanity as an End) এর উল্লেখ করেন। এই ন্যায়নীতি অনুসারে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নিজের এবং অপরের অন্তরস্থ মানবতাকে সর্বদা লক্ষ্য (End) হিসেবে গণ্য করতে হবে, কেবলমাত্র উপায় (Means) হিসেবে নয়।[১৩]

অনেক দার্শনিকগণ মনে করেন, এই FHE এর মাধ্যমে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেককে বিমূর্ত ব্যক্তিসত্তা হিসেবে গণ্য করে, তাদের যথাযোগ্য সম্মান প্রদান করা জরুরী। 'মানবতা' (Humanity) নামক সাধারণ ধর্মটি যাদের মধ্যে বর্তমান, তারাই মানব। সুতরাং সকল মানুষের ক্ষেত্রে এই প্রকারের ন্যায়নীতিটি প্রযোজ্য হবে। কিন্তু স্টার্ক মনে করেন, কান্টের এই সর্বোচ্চ নৈতিক নীতি FHE বিষয়ে উক্তপ্রকার ব্যাখ্যাটি অযথার্থ। তিনি বলেন, কিছু কিছু দার্শনিকদের মতে FHE দাবি করে, প্রত্যেক অপরকে বিমূর্ত ব্যক্তি সত্তা হিসেবে গণ্য করে তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। অপরের ঐতিহাসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি অবস্থান নির্বিশেষে, শুধুমাত্র মানবতার ভিত্তিতে তাদের শ্রদ্ধা করতে হবে। নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের প্রতি নিরপেক্ষ মনোভাবাপন্ন হয়ে, তাদের সম্মান জ্ঞাপন করতে হবে। কিন্তু FHE-কে উক্ত ভাবে ব্যাখ্যা করলে সেটি যথাযথ হয় না। তাই স্টার্ক-এর বক্তব্য, FHE-কে বুঝতে হবে ন্যায়পরায়ণতা এবং যথার্থতার একটি মানদণ্ড হিসেবে। তাহলেই দেখা যাবে, সকল প্রকার নৈতিক শুভ বা যথার্থ ক্রিয়া হল অপরের অন্তরস্থ মানবতার প্রতি

---

[১৩] Kant, Immanuel. *Grounding for The Metaphysics of Morals,* 3rd ed. Trans. James W. Ellington. Indianapolis: Hackett Publishing, 1993, p. 429.

শ্রদ্ধাশীল হওয়া। যদিও এটি সত্য যে, আমরা সকলে মানবতাসম্পন্ন প্রাণী হওয়ায়, প্রত্যেকেরই একটি নৈতিক মূল্যবোধ আছে। কিন্তু তার মানে এমন নয় যে অপরকে শ্রদ্ধা করার অর্থ হল, কেবলমাত্র তার বৌদ্ধিক বা যৌক্তিক সত্তাকে গুরুত্ব আরোপ করা।

স্টার্ক আরো বলেন, কান্ট তার নীতিতত্ত্বে উল্লেখ করেছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির চূড়ান্ত বা চরম নিঃশর্ত মূল্য বর্তমান (absolute unconditional worth)। আমরা প্রত্যেকে স্বশাসিত, বৌদ্ধিক কর্তা, তাই আমরা মূল্যবান। বৌদ্ধিক সত্তা বা বৌদ্ধিকতা, প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিশেষ মূল্যবান করে তোলে। এই প্রকার চূড়ান্ত নিঃশর্ত মূল্যই মানুষকে 'End in itself' করে তোলে। আর এই মূল্যবোধের দ্বারাই প্রত্যেকে, নিজেকে এবং অপরকে শ্রদ্ধা করতে বাধিত থাকে। এই মূল্যবোধই মানুষকে, অপরকে উপায় হিসেবে গণ্য না করার শিক্ষা দেয়। বৌদ্ধিকতার দ্বারাই একজন নৈতিক কর্তা, অপরকে এবং নিজেকে উপায়ের পরিবর্তে লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করেন। কারণ কান্টীয় তত্ত্বানুসারে ব্যক্তির নিজের প্রতিও কর্তব্য বর্তমান। তাই কান্ট আত্মহত্যাকে অনৈতিক হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রত্যেকের চরিত্রের নির্দিষ্ট এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, আবেগ এবং সামাজিক অবস্থান প্রভৃতি বিষয়গুলি নৈতিকতার প্রেক্ষিতে অপ্রাসঙ্গিক। এক কথায় বলা যায়, সকলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত- এইরূপ নৈতিক নীতির ভিত্তিস্থল ব্যক্তির অন্তরের মনুষ্যত্ব। মানবতা সম্পন্ন ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া সকলের কর্তব্য।

স্টার্ক মনে করেন, যদিও কান্টীয় তত্ত্ব অনুসারে প্রত্যেককে অবশ্যই শ্রদ্ধা করতে হবে কারণ, তারা বৌদ্ধিকতার প্রতিনিধি (agent), কিন্তু বাস্তবে কাউকে শ্রদ্ধা করার অর্থ কেবলমাত্র তার বৌদ্ধিক সত্তাকেই শ্রদ্ধা করা নয়। বলাবাহুল্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তির প্রয়োজন, নির্দিষ্ট পরিস্থিতি, উদ্বেগ, আকাঙ্ক্ষা, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট- প্রভৃতিকে উপেক্ষা করে, তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া খুবই দুরুহ হয়ে ওঠে। সুতরাং FHE-এর ভিত্তিস্বরূপ নিঃশর্ত অনুজ্ঞা

(Categorical imperative) আমাদের নির্দিষ্ট করে বলে দেয়না যে, কোন্ কার্যটি সঠিক। বরং কী প্রকারের কার্য করলে তা যথার্থ হবে, তার নির্দেশ দেয়। কান্টীয় তত্ত্বে, কোন্ ধরণের কার্য সম্পাদন করলে ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া যায়, তার উল্লেখ করা হয়েছে।

তাই স্টার্ক বলতে চেয়েছেন, কান্টের তত্ত্বে যে নিরপেক্ষতার উল্লেখ করা হয়, এটি কোন একটি নির্দিষ্ট ক্রিয়াকে সঠিক বা বেঠিক, যথার্থ বা অযথার্থ বলে চিহ্নিত না করে, কি কি প্রকারের ক্রিয়া সঠিক সেটির নির্দেশ দেয়। আর যেসকল কর্ম করলে অপরকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়, সেইরূপ কর্ম করতে হলে নির্দিষ্ট ব্যক্তির খুঁটিনাটি বিষয়ে ওয়াকিবহল বা সচেতন হওয়া বাঞ্ছনীয়। স্টার্ক-এর মতে কান্টের তত্ত্বে সম্পূর্ণ রূপে না হলেও, FHE নামক নীতিটির মাধ্যমে কিছু অংশে সাপেক্ষতা বা ব্যক্তির প্রতি বিশেষ ও বিস্তারিত ভাবে সচেতন হওয়ার কথা বলা আছে। কোন ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা পূর্বক আচরণ করতে হলে নিশ্চিত রূপেই তাঁর পুঙ্খানুপুঙ্খতা সম্পর্কে আমাদের সচেতন হতে হবে।

কিন্তু কান্টীয় নীতিতত্ত্বের নিরপেক্ষতা বিষয়ে স্টার্ক-এর উক্ত প্রকার ব্যাখ্যাটিকে হেল্ড সন্তোষ জনক মনে করেননি। হেল্ডের ব্যাখ্যা অনুসারে, কান্টের মতে নৈতিক কার্য সম্পাদন করার ক্ষেত্রে কর্তার কর্তব্য বোধটি যথেষ্ট। এক্ষেত্রে আবেগ (Good emotion) তথা অন্যান্য মানসিক বৃত্তি গুলির উল্লেখ থাকলেও, এদের উপস্থিতি আবশ্যিক নয়। এই প্রকার মানসিক বৃত্তি গুলি থাকতেও পারে, আবার না থাকলেও কোনো সমস্যা নেই। কান্ট নৈতিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে কর্তব্যপরায়ণতার উপস্থিতি পর্যাপ্ত হিসেবে স্বীকার করেছেন।

হেল্ড মনে করেন, স্টার্ক মাতা-পিতাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার বিষয়ে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার অন্তর্নিহিত দাবিটি আদোতে, কান্টের তত্ত্বের শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের নীতিটির সাথেই সামঞ্জস্যপূর্ণ। এক্ষেত্রে ব্যক্তির প্রতি বিশেষ সচেতনতা বা সাপেক্ষতার কথা স্টার্ক উল্লেখ করলেও, হেল্ড মনে

করেছেন সমস্ত নিরপেক্ষতাবাদীদের ব্যাখ্যায় বারংবার অনপেক্ষতাই বিজয়ী হয়ে এসেছে। স্টার্ক তাঁর ব্যাখ্যায় মাতা-পিতাকে শ্রদ্ধা করার ক্ষেত্রে যতই বিশেষ সচেতনতার কথা উল্লেখ করুন না কেন, বাস্তবে এটি কান্টীয় নিঃশর্ত অনুজ্ঞার সহিত সদৃশ। কান্টীয় তত্ত্বে এই নৈতিক নীতির উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষকে শ্রদ্ধা করা আমাদের কর্তব্য। সুতরাং নিজের মাতা-পিতাকে শ্রদ্ধা করাও আমাদের কর্তব্য, অর্থাৎ স্টার্ক-এর ব্যাখ্যাতেও যেপ্রকারের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এর উল্লেখ করা হয়েছে, সেটির উৎসও কিন্তু ব্যক্তির কর্তব্যবোধ।

হেল্ড আরো বলেছেন, দরদী প্রেক্ষিতে কোন কার্য সম্পাদন করা হলে, সেটি উক্তপ্রকারের থেকে ভিন্ন হবে। দরদী দৃষ্টিভঙ্গির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, ব্যক্তির মনোভাব এবং সম্পর্ক।

"Care is a practice involving the work of care-giving and the standards by which the practices of care can be evaluated.” [১৪]

হেল্ডের মতানুসারে, দরদের ক্ষেত্রে নৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বা মূল্যবান দুটি উপাদান বর্তমান। (two components)। প্রথমত- দরদ হল একটি অভ্যাস। অপরের প্রতি দরদী হওয়ার, মরমী হওয়ার অভ্যাস। দ্বিতীয়ত- দরদ হল একটি সদগুণ (value)। দরদের ব্যবহারিক প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে উক্ত দ্বিতীয় প্রকারে অর্থাৎ সদগুণরূপে দরদকে বুঝতে হবে (Care as a value)। এক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলিকে নৈতিক প্রেক্ষিতে বিবেচনা করা হবে সেই উপাদান গুলিকে খুঁজে বের করতে দরদ সহায়তা করে। দরদী দৃষ্টিভঙ্গী সংবেদনশীলতা, বিশ্বাস, পারস্পরিক উদ্বেগ প্রভৃতি উপাদান বা বিষয়গুলিকে নৈতিকতার প্রেক্ষিতে স্থান দেওয়া হয়ে থাকে। দরদী নীতিবিদদের মতে, মাতা-পিতাকে শ্রদ্ধা করা গুরুত্বপূর্ণ বা জরুরী কারণ

[১৪] Held, Virginia. 2006, p. 36.

এটি সম্পর্কের একপ্রকার অভিব্যক্তি বা প্রকাশ। এটি দুটি নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বিশেষের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যম। আর এই কারণেই শ্রদ্ধা করা ক্রিয়াটি নৈতিকভাবে মূল্যবান বলে হেল্ড দাবি করেন। অতএব কান্টীয় নিঃশর্ত অনুজ্ঞার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার কারণে শ্রদ্ধা করা কার্যটি নৈতিকভাবে মূল্যবান এমনটি নয়। দরদী নীতিবিদ্যায় এই ক্রিয়াটি নীতিগতভাবে মূল্যবান কারণ এটি একটি সম্পর্কের অভিব্যক্তি। [১৫] নিরপেক্ষ তত্ত্বগুলিতে, মূর্ত সম্পর্ককে অবজ্ঞা করে, বিমূর্ত অনপেক্ষতাকে প্রতিষ্ঠা করার স্বার্থে, কর্তব্যনিষ্ঠতাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়ে এসেছে। কিন্তু দরদী নীতিদর্শনের আলোচনায় বারংবার, নৈতিকতার প্রেক্ষিতে সম্পর্ক, সংযুক্তি, সাপেক্ষতা এবং সংবেদনশীলতার গুরুত্বের কথা উঠে এসেছে।

উদারপন্থী নারীবাদী তথা রাজনৈতিক দার্শনিক সুসান ওকিন (১৯৪৬-২০০৪), রলস-এর নীতিতত্ত্বের সমালোচনা করেন। রলস-এর বক্তব্যের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হলেও ওকিন স্বীকার করেছেন, রলস পরিবারকে নৈতিক মননের পরিণতি প্রাপ্তির প্রাথমিক প্রতিষ্ঠানরূপে চিহ্নিত করা সত্ত্বেও, পরিবারের অভ্যন্তরীণ জগতে উপস্থিত ক্ষমতার বৈষম্য, নারীর প্রতিবন্ধকতা, সীমাবদ্ধতা প্রভৃতি বিষয়গুলিতে আলোকপাত করেননি।

ওকিন তাঁর “Reason and Feeling in Thinking about Justice”-প্রবন্ধে রলসের নৈতিক পরিকাঠামো বিষয়ে বিশদ পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ করেছেন। ওকীনের মতে তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক পরিসরে রলসের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল- রলসীয় পরিভাষায় ‘আদি অবস্থান’ বা ‘মূল অবস্থান’ (Original Position)। এই আদি বা মূল অবস্থানে অবস্থিত হয়ে চিন্তন করা এমন একটি দার্শনিক যৌক্তিক পদ্ধতি যার উদ্দেশ্য, ন্যায্যতার একটি যথাযথ অর্থ ও বিশেষ রূপ উন্মোচিত করা। এই আদি অবস্থানের মাধ্যমে রলস ন্যায্যতার ব্যাখ্যা পূর্বক তার

---

[১৫] Held, Virginia. 2006, pp. 30-38.

প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যত হয়েছেন। ভবিষ্যৎ সমাজকে যথাযথভাবে চালনা করার লক্ষ্যে ভিন্ন মানসিকতাসম্পন্ন মানুষ একত্রিত হয়ে যখন কিছু মৌলিক এবং স্থায়ী ন্যায্যতার নীতি স্থির করেন, সেক্ষেত্রে দার্শনিক উক্ত পদ্ধতিকে ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগে, সমাজের বহুল ভিন্নতা সত্ত্বেও কিভাবে নির্দিষ্ট নিরপেক্ষ নীতি নির্ধারণ করা সম্ভব হবে? এই প্রসঙ্গে রলস, অজ্ঞতার আবরণের (Veil of ignorance) উল্লেখ করেন। এই অজ্ঞতার আবরণের দ্বারা সকল প্রকার বিশিষ্টতা, প্রত্যেক মানুষের প্রেক্ষিতের নির্দিষ্টতা, পারিপার্শ্বিক অবস্থানের ভিন্নতাকে অদৃশ্য করা হয়। রলসের এই অজ্ঞতার আবরণের চিত্রায়নের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হল- ন্যায্যতার নীতি গুলি যেন পক্ষপাতরহিত এবং স্বাধীনভাবে গ্রহণযোগ্য হয় সেটি নিশ্চিত করা। ওকিন মূলত দুটি লক্ষ্যে রলস প্রস্তাবিত এই পদ্ধতি বিষয়ক আলোচনাটি করেছেন।

প্রথমত : আশির দশকে রলসের এই ন্যায় পদ্ধতির বিরুদ্ধে উত্থাপিত হওয়া নানা প্রভাবশালী নারীবাদী সমালোচনা গুলির নিষ্পত্তি করার উদ্দেশ্যে প্রাথমিকভাবে ওকিন এই পুনর্পাঠ উপস্থাপনে আগ্রহী হয়েছিলেন।

দ্বিতীয়ত : ওকিন মনে করেছেন, রলসের তত্ত্বের একটি পরিমার্জিত রূপ গ্রহণ করা হলে সেটি নৈতিক ও রাজনৈতিক তত্ত্ব গুলির গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উপযোগী সাব্যস্ত হবে। যে বিশ্বে লিঙ্গ ক্রমশ এক অপ্রতিরোধ্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে, সেক্ষেত্রে রলসের তত্ত্ব কিছু পরিমার্জন সাপেক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান এক অনুমান বা বিচার পদ্ধতি হয়ে উঠতে পারে বলে ওকিন বোধ করেছিলেন।[১৬]

---

১৬ Okin, Susan Moller. "Reason and Feeling in Thinking about Justice." *Ethics* 99.2, 1989, pp. 229-230.

উনবিংশ শতকের আশির দশকের বহু নারীবাদী, রলসের এই মূল অবস্থান বিষয়ক চিন্তন পদ্ধতির বিরুদ্ধে আপত্তি প্রকাশ করেন। কিছু নারীবাদী দাবি করেন এই পদ্ধতির মাধ্যমে মানব স্বভাব প্রসঙ্গে অসমর্থনীয় অহংসর্বস্ব অনুমান বা পূর্ব শর্ত জ্ঞাপন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মানব প্রকৃতিকে অহংকেন্দ্রিক রূপে তুলে ধরার প্রবণতা স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু নারীবাদী ব্যাখ্যায়, এই মূল অবস্থানের ভাবনার সঙ্গে বাস্তবে মানুষের চরিত্র বা স্বরূপের সাদৃশ্য অত্যন্ত নিমিত্ত। একটি যথার্থ নৈতিক সমাজ বিষয়ে চিন্তিত বা সচেতন মানুষের প্রকৃতি প্রসঙ্গে এইরূপ অনর্থক পূর্বানুমান হেতু মূল বা আদি অবস্থানকে নারীবাদী বিভ্রান্তিকর মনে করেন। কিছু কিছু নারীবাদী বলেন রলসের নৈতিক ঐতিহ্য বা প্রথায় কেবল অধিকার ও অনুশাসন প্রাধান্য পেয়েছে। এক্ষেত্রে প্রেক্ষিত, অনুষঙ্গ, দরদের মূল্য এবং বিশেষ বা নির্দিষ্ট অপরের প্রতি উদ্বেগের গুরুত্ব অনুপস্থিত। অপর একদল নারীবাদী মনে করেন, রলস পক্ষপাতরাহিত্য এবং সর্বজনীনতা বিষয়ে মাত্রাতিরিক্ত আচ্ছন্ন থাকার দরুন অপরের বিশিষ্টতা এবং ভিন্নতার প্রতি যথার্থ মর্যাদা জ্ঞাপনে ব্যর্থ হয়েছেন।

ওকিন লক্ষ্য করেন, রলসের নৈতিক তত্ত্বের প্রতি নারীবাদী আপত্তিগুলির মূল কারণ হল- বিমূর্ত বৌদ্ধিকতার উপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপবশত রলস ব্যক্তির অনুভূতি, উদ্বেগ, আবেগের নৈতিক তাৎপর্যকে উপেক্ষা করেছেন। পক্ষপাতরাহিত্য এবং সর্বজনীনতা বিষয়ে অধিক চিন্তিত হয়ে তিনি অপরতা ও ভিন্নতার প্রতি যথার্থ মর্যাদা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। ওকিন মনে করেন, রলসের আদি অবস্থান ও তার কার্যকারিতা প্রসঙ্গে বিভ্রান্তিমূলক ধারণার দরুন এই প্রকার সমালোচনাগুলির সূত্রপাত হয়েছে। কান্টীয় নীতিতাত্ত্বিক আদোলে রলসের তত্ত্বের উপস্থাপনা হেতু নারীবাদী আপত্তি গুলির আবির্ভাব হয়েছে বলে ওকীনের বিশ্বাস। যদিও পরবর্তীকালে রলস স্বয়ং তাঁর বক্তব্যের উক্ত উপস্থাপনাকে ত্রুটিপূর্ণ বলেই দাবি করেন। আদি অবস্থানের চিন্তা পদ্ধতিকে প্রজ্ঞা দ্বারা চালিত প্রক্রিয়া হিসেবে বিবৃত করার প্রবণতাকে ওকিন

ভ্রান্তিমূলক ত্রুটিরূপে বর্ণনা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি এমন একটি নতুন ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রচেষ্টা করেন যার সাহায্যে আদি অবস্থানে অপরের প্রতি দায়বদ্ধতা, দায়িত্ব, দরদ এবং উদ্বেগের স্বরকে তুলে ধরা সম্ভব হবে। রলস-এর তত্ত্বের গর্ভে যে স্বরের অনুরণন হয় তা বাস্তবে অপরের প্রতি যত্ন, দায়বদ্ধতা, দরদ ও উদ্বেগের স্বর। আদি অবস্থান সম্পর্কিত ওকীনের এই পুনর্ব্যাখ্যার মাধ্যমে, উক্ত প্রকার ধারণাকে প্রদর্শন করার প্রয়াস নজরে আসে। নিম্নে উল্লেখিত চারটি যুক্তির মাধ্যমে তিনি এটির ব্যাখ্যা দেন।

প্রথমত : আদি অবস্থানে অবস্থিত কর্তার মুখ্য উদ্দেশ্য হল- প্রাথমিক সামাজিক পণ্য গুলির সমবন্টন। সমাজে প্রত্যেকের মধ্যে এই পণ্যের ন্যায্য বন্টন সুনিশ্চিত করাই আদর্শ নৈতিক কর্তার দায়িত্ব। কিন্তু এইরূপ বক্তব্যের অর্থ এমন কখনোই নয় যে, রলস প্রত্যেক ব্যক্তিকে অহংসর্বস্ববাদী হিসেবে অনুমান করে তত্ত্ব রচনা করেছেন। এক্ষেত্রে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে একটি উদাসীনতার পূর্ব শর্তের উল্লেখ আছে। এই পারস্পরিক উদাসীনতার পূর্ব শর্ত এবং অজ্ঞতার আবরণকে একসঙ্গে সংযুক্ত করে দেখতে হবে। এই দুটিকে যুক্ত করে দেখলে বোধ করা যায় যে, ব্যক্তি কেবল আত্মস্বার্থ সিদ্ধির ক্ষেত্রেই তৎপর এমন নয়, বরং পরহিত সাধন এবং অপরের প্রতিও সে উদ্বিগ্নতা অনুভব করে থাকে।

দ্বিতীয়ত : অধিকাংশ দার্শনিক এই আদি অবস্থানের পদ্ধতিকে নির্বাচন পূর্বক দেখাতে উদ্যোগী হয়েছেন যে, তাঁরা অহংসর্বস্ব চিন্তন পরিত্যাগ করায় আগ্রহী। আদি অবস্থানের চিন্তন পদ্ধতি প্রয়োগ করে যে ধরনের দায়বদ্ধতা অভিব্যক্ত হয় তা হল- ব্যক্তি নিজের প্রতি যে পরিমাণে সংবেদনশীল, প্রত্যেক অপরের প্রতিও তিনি সমমাত্রায় মরমী হবেন।

তৃতীয়ত : কেবলমাত্র অজ্ঞতার আবরণের আড়ালেই প্রতিটি ব্যক্তি প্রভেদ বা পার্থক্য শূন্য। কিন্তু এই আবরণকে দূরীভূত করলেই দেখা যাবে, তাঁরা প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক ব্যক্তি সত্তা এবং তাদের প্রত্যেকেরই সামাজিক অবস্থান গুলি ভিন্ন ভিন্ন। ওকিন মনে করেন, রলসের এই আদি অবস্থানটি কখনোই সম্পূর্ণরূপে বিমূর্ত অবস্থা নয়। এই অবস্থানের মাধ্যমে মানুষের

জাগতিক জীবনের সকল বাস্তবতা থেকে বিমূর্তীকরণ হয় এইরূপ ধারণা ভ্রান্ত। বরং ওকিনের মতে এটি এমন এক পদ্ধতি, যার সাহায্যে ব্যক্তির সামাজিক এবং অন্যান্য সকল পার্থক্য গুলিকে চিহ্নিত করে বিশেষ রূপে মর্যাদা ও গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব।

সর্বশেষে, যে সকল দার্শনিক এই পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন তাঁরা অবশ্যই প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করার ক্ষমতা রাখেন। ব্যক্তির নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে তার অবস্থা প্রসঙ্গে তাঁরা ভাবিত। সুতরাং ওকীনের ব্যাখ্যা অনুসারে, ব্যক্তি অজ্ঞতার আবরণে আবৃত হয়ে চিন্তন করলে তার মধ্যে অপরের প্রতি সহমর্মিতার সামর্থ্য উৎপন্ন হয়। কথোপকথন বা আলাপচারিতার মাধ্যমে এমন এক ক্ষমতা অর্জিত হয় যার সাহায্যে ভিন্ন ব্যক্তি জীবনের বিভিন্নার্থ এবং তার স্বরূপ উপলব্ধ হয়।

সুসান ওকীনের ভাবনা অনুসারে, আদি অবস্থানের তত্ত্বটিতে অপরের প্রতি সহমর্মিতা, যত্ন, অপরের ভিন্নতার প্রতি বিশেষ সচেতনতা প্রভৃতি উপাদানগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রলসের নৈতিক ঐতিহ্যের বিপক্ষে যে সমালোচনাগুলি উঠে এসেছে সেগুলিকে দূরীভূত করার লক্ষ্যে ওকিন এই মূল অবস্থানের একটি পুনর্পাঠ দিতে আগ্রহী হয়েছেন। তাঁর মতে, রলস-এর এই নৈতিক পন্থায় কখনোই এমন কোন পূর্বশর্ত গৃহীত হয়নি যে মানুষের প্রকৃতি হল অহংসর্বস্ব। স্পষ্টভাবে উল্লিখিত না হলেও এই পদ্ধতিতে, অপরের বিবিধতাকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং অপরের প্রতি মরমি হওয়ার ক্ষীন ইঙ্গিত উপস্থিত বলে ওকিন মনে করেছেন।

অনেক নারীবাদী ওকিনের এই ব্যাখ্যার সঙ্গে সহমত হতে পারেননি। গিলিগান, নডিংস, ব্লাম প্রমুখ দরদী নীতিবিদরা দেখিয়েছেন, দরদ বা যত্ন এমন একটি প্রক্রিয়া যা বিশেষ অপরের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলে কার্যকরী হয়ে থাকে। আবার এর বিপরীতে আছে এক ধরনের নৈর্ব্যক্তিক, বিমূর্ত, সর্বজনীন, সাধারণ, মানব জাতির প্রতি সামান্যীকৃত অনুরাগ, যা রলসের ভাষায় ন্যায্যতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণরূপে বর্ণিত হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর আশির দশকের দরদী নীতিবিদগণ মনে করেন, ওকিনের এই পুনর্পাঠটি প্রকৃত অর্থে দরদ ও ন্যায্যতার মধ্যবর্তী ফারাককে বর্জন করে, উভয় কোটির মধ্যে সেতুবন্ধন করতে অসমর্থ। এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন উঠে আসে, নৈতিক কাঠামোর অন্তর্গত লিঙ্গ রাজনীতি বা অসমতাকে দূর করার ক্ষেত্রে ওকিন দ্বারা প্রস্তাবিত আদি অবস্থানের সংশোধিত সংস্করণ বা বর্ণনাটিকে কি আদৌ কার্যকরী পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা যায়?

ওকিন, রলসীয় আদি অবস্থানের বিরুদ্ধে উঠে আসা নারীবাদী সমালোচনার যথাসাধ্য সমাধান করার চেষ্টা করলেও এবিষয়ে তার নিজস্ব নারীবাদী উদ্বেগ ছিল। রলসীয় তত্ত্বের একটি অযৌক্তিক পূর্বশর্ত হল- পরিবার একগামী, কেন্দ্রীয় নৈতিক প্রতিষ্ঠান। পরিবারের ধর্ম একগামিতা এবং এটি স্বয়ং ন্যায্যতার প্রতীক। কিন্তু এই দাবিটিকে অনেক নারীবাদী অস্বীকার করেছেন। রলস তাঁর আদি অবস্থানে অবস্থিত সদস্যদের, পরিবারের কর্তা রূপে বিশেষিত করেছেন, আর এই প্রধান সদস্যবৃন্দ ন্যায্যতা বিষয়ে পরিপূর্ণরূপে অবগত ও সচেতন বলেই রলস মনে করেন। কিন্তু বাস্তবে আদৌ রলসের এই পদ্ধতির মাধ্যমে পারিবারিক বিবাদ বা পরিবারের অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলির সমাধান সম্ভব কিনা- এই বিষয়ে নারীবাদী প্রবল সংশয় প্রকাশ করেন।

ওকিন, রলস-এর মূল অবস্থানের ব্যাখ্যাকে সংশোধন এবং পরিমার্জনের দ্বারা এটিকে একটি নতুন স্বচ্ছতা দিয়েছেন। তিনি দেখাতে সচেষ্ট হয়েছেন যে, এই পদ্ধতিকে ব্যবহার করে পারিবারিক বিন্যাস অর্থাৎ ব্যক্তিগত পরিসরেও ন্যায্যতা বিষয়ক প্রশ্ন তোলা সম্ভব। ওকিন বিশেষ ভাবে রলসীয় তত্ত্বের পরিবার প্রধানের পূর্ব শর্তটিকে বাতিল করেছেন। এখানে বলা যেতে পারে যৌন পরিচয়, লিঙ্গ পরিচয় তথা অপরাপর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলিকে অজ্ঞতার আবরণের দ্বারা আড়াল করে, ন্যায্যতার নীতির সাহায্যে সামাজিক লৈঙ্গিক কাঠামো এবং পারিবারিক বিন্যাস ব্যবস্থাকে যথাযথ ভাবে পরিচালনা করা যেতে পারে।

ওকিন তাঁর *Justice, Gender and the Family* -গ্রন্থে রলসের আদি অবস্থান প্রসঙ্গে দাবি করেন-

"...a powerful concept for challenging the gender structure."[১৭]

তাঁর মতে, আদি অবস্থানের এইরূপ সংশোধিত ও পরিমার্জিত রূপটি একটি অত্যন্ত বলশালী ধারণা, যার সাহায্যে লৈঙ্গিক পরিকাঠামো অর্থাৎ সমাজের লিঙ্গ-অনপেক্ষ কাঠামোকে প্রশ্ন করা সম্ভব।

এবারে প্রশ্ন হল, ওকিন প্রদত্ত মূল অবস্থানের এই পরিমার্জিত রূপটিকে কি নারীবাদী যথার্থ শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেন? একথা বলা যেতে পারে যে, এই আদি অবস্থান এমন একটি নৈতিক মূল্যায়ন পদ্ধতি যার সাহায্যে দার্শনিকরা প্রস্তাবিত ন্যায্যতার নীতিগুলিকে পরিশুদ্ধ করতে এবং অন্যায্য নীতিকে প্রতিরোধ করতে পারেন। ওকিন মনে করেন তাঁর বক্তব্যে আদি অবস্থানের যে নতুন মাত্রা লাভ করা যায়, তার দ্বারা অন্যায়কে আটকানো সম্ভব এবং পারিবারিক জগতে লিঙ্গ-বৈষম্য প্রসূত অন্যায্য শ্রম বিভাজনকেও প্রতিহত করা সম্ভব হবে। কিন্তু অনেক সমালোচক দাবি করেন, বাস্তবে এটি করা অসম্ভব, অর্থাৎ লিঙ্গ-বৈষম্য যেমন আটকানো যায় না, তেমনি আরো নানা ধরনের বৈষম্য যেগুলি- শ্রেণী, ধর্ম, জাতি, মানুষের শারীরিক ক্ষমতা-অক্ষমতা জনিত কারণে ঘটে থাকে, সেগুলিকেও আটকানো যায় না। এই আপত্তিগুলির ফলে সাধারণ একটা প্রশ্ন থেকেই যায় যে, মূল অবস্থান থেকে কতটা ন্যায্যতা প্রত্যাশা করা যেতে পারে?

ওকিন আদি অবস্থানের পরিবর্তিত ব্যঞ্জনাটির পুনরায় সংশোধনের সুযোগ উন্মুক্ত রাখতে চেয়েছেন। তিনি মনে করেন, একথা অনস্বীকার্য যে রলসের তত্ত্বভূমিতে সব রকমের স্বরের স্পষ্ট অনুরণন অনুপস্থিত। তাই তা নারীবাদীর অননুমোদনের কারণ হয়েছে। রলসের আদি অবস্থানটি সরল অর্থে প্রতিনিধিত্বের এক হাতিয়ার বা উপায়, যার সাহায্যে বিভিন্ন

[১৭] Okin, Susan Moller. *Justice, Gender, and the Family,* New York: Basic, 1989, p. 109.

দার্শনিক তাদের পছন্দের নীতিগুলি গ্রহণের স্বপক্ষে যুক্তি দিয়েছেন। এক্ষেত্রে দার্শনিকরা যদি আদি অবস্থান পরিমার্জন করার সুযোগ পান তাহলে সেটি একটি পরিবর্তনযোগ্য পদ্ধতি হয়ে উঠবে ঠিকই, কিন্তু এর ফলে বিচারমূলক ক্ষমতার ধারণাটি দুর্বল হয়ে পড়বে।[১৮] যে সকল দার্শনিক এই পদ্ধতির পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন তাঁরা দেখাতে চেয়েছেন, আদি অবস্থানের প্রক্রিয়ার সাহায্যে সমাজে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। অপরপক্ষ মনে করেছেন, রলসের তত্ত্ব নারী তথা সকল প্রান্তিক মানুষ অর্থাৎ সমাজের অধঃতন, অপেক্ষাকৃত কম সুবিধাভোগী শ্রেণীর অভিজ্ঞতা, সংবেদ উপেক্ষা করে সৃজিত হয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের প্রতিনিধিত্বও অনুপস্থিত। নারী তথা বিবিধ বিপন্ন, প্রান্তিক মানুষের যাপন অভিজ্ঞতার বহুত্ব ও বিশিষ্টতাকে উপেক্ষা করে, একপ্রকার সাধারণ বিমূর্ত চিন্তাভ্যাসের প্রবণতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এবারে ভেবে দেখা প্রয়োজন, কেন সিংহভাগ দার্শনিক তাদের নৈতিকতা বিষয়ক চিন্তনকে আদি অবস্থানের মাধ্যমে বর্ণনা করায় আগ্রহী হয়েছেন। রলসের মূল উদ্দেশ্য ছিল- বিভিন্ন ধরনের নৈতিক ভাবনাগুলিকে এমন একটি বিশেষ আকারে নিয়ে আসা, যার সাহায্যে সহজেই দৃঢ়, পক্ষপাতরহিত এবং প্রসঙ্গ-অনপেক্ষ ন্যায্যতার নীতি নির্বাচন করা সম্ভবপর। তিনি মনে করেছিলেন, নৈতিকতা রক্ষার্থে পারস্পরিক উদাসীনতা এবং অজ্ঞতার আবরণ থাকা আবশ্যিক। আপাত দৃষ্টিতে রলসের বক্তব্যের মধ্যে কোথাও একটা লাঘব যুক্তি আছে। তিনি সরলতা ও স্বচ্ছতাকে মর্যাদা দিয়েছেন। কিন্তু তাতে বাস্তব জগতের জটিলতা, বৈচিত্র, বিবিধতা প্রভৃতিগুলি যেন হারিয়ে গিয়েছে। ওকিন স্বয়ং একটি বিষয় তুলে ধরেছেন যে, আমরা যখন মূল অবস্থান থেকে চিন্তা করি তখন দার্শনিক হিসেবে এইরূপ চিন্তা করার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে যে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এবং সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে আমরা যত ধরনের ভিন্নতা কল্পনা করতে পারি, সেই সবকটিকে মাথায় রাখতে হবে। প্রতিটি দৃষ্টিভঙ্গি, প্রতিটি প্রেক্ষিত থেকে অপরকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে। কিন্তু এটি একটি অত্যন্ত দুরুহ কাজ। ওকিন

[১৮] Okin, Susan Moller. 1989, p. 238.

নিজেও স্বীকার করে নিয়েছেন যে এটি কোন সহজ সরল চাহিদা বা দাবি নয় (“far from a simple demnd”)।[১৯]

ওকিনের আলোচনার সূত্রপাত হয় নারীবাদী সমালোচনার অনুষঙ্গে, আদি অবস্থানের একটি স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট ধারণা প্রদর্শন এর লক্ষ্য নিয়ে। তবে তাঁর ব্যাখ্যায় রলসের নৈতিক পদ্ধতির অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতা পরিস্ফুট হয়েছে। প্রারম্ভকালে ওকিন রলসের নৈতিক ঐতিহ্যের দ্বারা নিবিড়ভাবে প্রভাবিত ছিলেন ঠিকিই, কিন্তু পরবর্তীতে বহু বছর ব্যাপী লৈঙ্গিক ন্যায্যতা বিষয়ক চর্চাকালীন ওকিন, রলস তথা বিবিধ চিরায়ত নীতি তাত্ত্বিক পরিকাঠামোর অভ্যন্তরস্থ শিথিলতাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আদি অবস্থানের ধারণাকে ওকিন সরাসরি বা ঘোষিতভাবে প্রত্যাখ্যান না করলেও, পরবর্তীকালীন চর্চায় তিনি নীরবে এই ধারণাকে পরিত্যাগ করেছেন।

ওকিন তথা অপর অনেক নারীবাদী মনে করেন পরিবার হল- কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। অনপেক্ষ, ন্যায্য সামাজিক পরিকাঠামো প্রস্তুত করাই যদি ধ্রুপদী নীতি দার্শনিকের কাঙ্খিত হয়ে থাকে, তাহলে পরিবারের অভ্যন্তরীন সমস্যা, বৈষম্য, ক্ষমতার অসম বন্টন প্রভৃতি বিষয়গুলিকেও নৈতিকতার প্রেক্ষিতে গুরুত্ব আরোপ করা আবশ্যক। রলস তথা মূলস্রোতের সিংহভাগ তত্ত্ব কাঠামোয় পরিবারের অন্দরমহলে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব, বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলাকে কখনোই নৈতিকতার প্রেক্ষিতে চিহ্নিত করা হয়নি। সুতরাং বলা যেতেই পারে, লিঙ্গ-সমতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রলস সম্ভবত সচেতন ছিলেন না। তাই যাপন অভিজ্ঞতা ও প্রেক্ষিত-সচেতনতাকে চিহ্নিত না করে তিনি পক্ষপাতরাহিত্যের আদর্শকে গ্রহণ করেছেন এবং বৌদ্ধিকভাবে নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা বলেছেন। অতএব নারীবাদী পক্ষ অবলম্বন করে বলা যায়, রলস নৈতিক ভাবাবেগকে অবহেলা, অবজ্ঞা করে নৈতিক যৌক্তিকতা ও বুদ্ধির প্রাধান্যকে স্বীকার করার মাধ্যমে আসলে পুরুষ পক্ষপাত করেছেন।

---

[১৯] Okin, Susan Moller. 1989, p. 244.

চতুর্থ অধ্যায়

বার্নার্ড গার্টের ভাবনায় পক্ষপাতরাহিত্য : একটি নৈতিক মূল্যায়ন

এই অধ্যায়ে বার্নার্ড গার্ট-এর (১৯৩৪-২০১১) মতানুসারে পক্ষপাতরাহিত্যের নানা মাত্রা বিষয়ে বিশদ আলোচনা করার প্রচেষ্টা হয়েছে। গার্ট মনে করেন, 'পক্ষপাতরাহিত্য' একটি জটিল ও দুরূহ ধারণা। ধ্রুপদী নীতিতত্ত্বে বিশেষত বুদ্ধীবাদী দার্শনিক ঘরানায় এই ধারণার সরলীকরণ করা হয়েছে। মূলস্রোতের ভাবনায় পক্ষপাতরাহিত্য নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির এক আবশ্যিক বৈশিষ্ট। বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা দ্বারা চালিত হয়ে নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির যে নৈর্ব্যক্তিক, নিরালম্ব দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন সেই প্রসঙ্গে পক্ষপাতরাহিত্য এক অপরিহার্য ধারণা। সেই কারণেই মূলস্রোতের নীতিতত্ত্বে ব্যক্তি বিশেষের অবস্থান, বাস্তব অনুষঙ্গ বা বিষয়ের সাপেক্ষে নৈতিক বিচার তথা সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোনও অবকাশ নেই। বুদ্ধিবাদী তত্ত্বে নৈতিকতা দেশ, কাল, পাত্র, পরিস্থিতি এবং অভিজ্ঞতা অনপেক্ষ, কারণ এই মতে নৈতিক হবার অর্থ সার্বিক আকারগত এক অনুশাসন অনুসারে আচরণ করা। বাস্তব জীবনে ব্যক্তি তার অভিজ্ঞতা, পরিস্থিতি, বিচারবোধ এবং আবেগ দ্বারা চালিত হলেও ধ্রুপদী নীতিতত্ত্বে এই বিষয়গুলির কোন গুরুত্ব নেই; নৈতিক আদর্শের খাতিরে সকল সাপেক্ষতা দূরে সরিয়ে, শুধুমাত্র নীতি দ্বারা চালিত হয়ে কর্ম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গার্টের মতে নৈতিকতার পরিসরে পক্ষপাতরাহিত্যের ভুমিকা, গুরুত্ব এবং প্রাসঙ্গিকতা গ্রহণযোগ্য রূপে উপস্থাপন করতে এবিষয়ক একটি বিচারমূলক ব্যাখ্যা আবশ্যক। তাঁর মতে একজন নৈতিক কর্তা কার প্রতি নিরপেক্ষ আচরণ করছে এবং কোন্ পরিস্থিতি বা প্রেক্ষিতে নিরপেক্ষ অবস্থান অবলম্বন করছে- সেটি বিবেচনা করা জরুরী। তিনি দাবি করেন পক্ষপাতশূন্যতা একটি আকার সর্বস্ব, শূন্যগর্ভ শব্দ বা পরিভাষা নয়; এই ধারণার মধ্যে যে তিনটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সেগুলি হল ক্রমে- ১) কর্তা অর্থাৎ যিনি নিরপেক্ষ নির্বাচন করেন, ২) অপর- অর্থাৎ যার

প্রতি নিরপেক্ষ আচরণ করা হয়েছে এবং ৩) বিষয় বা ক্ষেত্র যার প্রেক্ষিতে নিরপেক্ষ আচরণ করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে- একজন শিক্ষক তাঁর ছাত্রদের পরীক্ষা নেওয়ার সময়ে খেয়াল রাখেন তিনি যেন উত্তরপত্রের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ থাকেন।

সাধারণত পক্ষপাতশূন্যভাবে কোনো নীতি নির্বাচন করার অর্থ হলো, বিশেষ প্রেক্ষিতের চিন্তা বা উদ্বেগের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে নীতি অনুসরণপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, অর্থাৎ নির্বাচন বা সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ব্যক্তির বিশেষ কোন চিন্তা, স্বার্থ, প্রকল্প, ক্ষমতা, অপরের প্রতি বিশেষ সখ্যতাভাব প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া কাম্য। গার্ট-এর অভিমত, পক্ষপাতরাহিত্যের সাধারণ ধারণাটিকে যেরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, নৈতিকতার ক্ষেত্রেও প্রায় সেইরূপ পক্ষপাতরাহিত্য প্রয়োজনীয়। তবে নৈতিক পরিসরে ব্যবহৃত হবার ক্ষেত্রে কে, কোন ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর প্রতি এবং কোন বিষয়ে নিরপেক্ষ আচরণ করবেন- সেই বিষয়গুলি নির্দিষ্ট করা অত্যন্ত জরুরী। তিনি ফলাফলমুখী তত্ত্ব, মূলত জন স্টুয়ার্ট মিলের উপযোগিতাবাদ এবং কর্তব্যমুখী তত্ত্ব বিশেষত কান্ট, রলসের তত্ত্বের বিচার ও বিশ্লেষণ পূর্বক পক্ষপাতরাহিত্য বিষয়ে নিজমত প্রতিষ্ঠা করেছেন।

জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁর- *Utilitarianism* গ্রন্থে নৈতিকতা এবং পক্ষপাতরাহিত্য বিষয়ে দুটি পরস্পর বিরুদ্ধ মন্তব্য করেন। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি প্রথমে বলেন-

> "As between his own happiness and that of others, utilitarianism requires him to be as strictly impartial as a disinterested and benevolent spectator"[১]

অর্থাৎ উপযোগবাদ অনুসারে, নিজের সুখ এবং অপরের সুখের খাতিরে কর্তব্য নির্বাচন করার ক্ষেত্রে কর্তাকে সম্পূর্ণরূপে পক্ষপাতরহিত থাকতে হবে, হিতৈষী দর্শক ও কর্তারূপে

---

[১] Mill, John Stuart. *Utilitarianism*, Batoche Books Ltd, Canada, 2001, p. 19.

অবস্থান করতে হবে। আবার এই একই গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে মিল, উক্ত বিষয়টিকে বিশ্লেষণ সহকারে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথমে তাঁর ব্যাখ্যায় মনে হয়েছিল তিনিও পক্ষপাতশূন্যতাকে কর্তব্য রূপে (Duty in itself) দেখেছেন। কিন্তু তাঁর পরবর্তী ব্যাখ্যায় পক্ষপাতশূন্যতাকে স্বতন্ত্রভাবে কর্তব্য রূপে গ্রহণ করা হয়নি বরং এটিকে অপর কোন কর্তব্যের সহায়ক রূপে বিবেচনা করা হয়েছে। তাঁর মতে আনুকূল্য এবং পছন্দকে সর্বদা নৈতিক মূল্য নিরপেক্ষ বলে অবজ্ঞা করা যায় না। যদি কোন পরিস্থিতিতে কর্তার আনুকূল্য এবং ব্যক্তিগত পছন্দকে নিন্দিত হতে হয় তাহলে সেটি অবশ্যই একটি ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি, কোন সার্বিক নিয়ম নয়। একজন ব্যক্তি অপরের কোনরকম ক্ষতি না করে, অপরকে কোনভাবে বঞ্চিত না করে, অন্য কোন প্রকার কর্তব্যের লঙ্ঘন না করে, যদি নিজের পরিবার এবং বান্ধব তথা কাছের মানুষের প্রতি কোনরূপ পক্ষপাতমূলক আচরণ করে, তাহলে সেই আচরণ আবশ্যিকরূপে অনৈতিক বা অযথার্থ নয়। আমরা সাধারণত দেখি যে কোনরূপ কর্তব্যের লঙ্ঘন না করে যদি একজন ব্যক্তি নিকটজনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার পরিবর্তে অপরিচিত ব্যক্তির প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেয় তাহলে তাকে প্রশংসিত না করে তিরস্কার করা হয়ে থাকে।[২]

গার্ট মনে করেন, দুর্ভাগ্যবশত অধিকাংশ দার্শনিক নৈতিকতা এবং পক্ষপাতরাহিত্যের সম্বন্ধকে মিল প্রদত্ত প্রথম প্রকার ব্যাখ্যানুসারে গ্রহণ করে থাকেন। মিল তাঁর প্রথম প্রকার ব্যাখ্যায় যা বলেছিলেন সেটিকেই অনুসরণ করে তাঁরা মনে করেন যে পক্ষপাতরহিত থাকার অর্থ হল- কর্তার ব্যক্তিগত সুখ এবং অপরের সুখের মধ্যে নির্বাচন করার ক্ষেত্রে, কর্তা সামগ্রিকভাবে নিরপেক্ষ থেকে হিতৈষী দ্রষ্টার ভূমিকা পালন করবেন। এতদনুসারে ধ্রুপদী দার্শনিকদের বক্তব্য হল, পক্ষপাতরাহিত্যের অর্থ প্রত্যেকের স্বার্থকে সমভাবে গুরুত্ব প্রদান করা। কিন্তু গার্টের মতে, পক্ষপাতরাহিত্য বিষয়ক উক্ত বিবৃতিটি বিভ্রান্তিকর। ‘পক্ষপাতরাহিত্য’-রূপ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী

[২] Mill, John Stuart. 2001, p. 44.

কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে কিছু সংখ্যক মানুষ যাদের স্বার্থ বা প্রয়োজন বিবেচিত হচ্ছে, কেবল তাদের প্রত্যেকের স্বার্থের ক্ষেত্রে সমান গুরুত্ব আরোপ করতে সক্ষম হতে পারে। এক্ষেত্রে পৃথিবীর সকল ব্যক্তির স্বার্থকে সমান গুরুত্ব দেওয়ার প্রসঙ্গ নেই।

মিল তাঁর গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন, ধরা যাক্- কোন একটি বিষয় বা বস্তুর অধিকার প্রসঙ্গে দুই পক্ষের মধ্যে বিতর্ক আছে এবং এই বিষয়ক বচসার মীমাংসা করার উদ্দেশ্যে একটি বিচারসভা আয়োজিত হয়েছে। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিচার পদ্ধতিটিকে আবশ্যিক ভাবে নিরপেক্ষ হতে হবে। কারণ যে দুটি দলের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হয়েছে, তাদের মধ্যে বিশেষ এক পক্ষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা হলে তার পক্ষে রায় প্রদান করা এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠা করাই বিচার সভার দায়িত্ব। অপর কোন বিষয়ে বিবেচনা না করে, কেবলমাত্র কোন পক্ষের ন্যায্য অর্থে বস্তুটির ওপর অধিকার আছে তা নিরপেক্ষ ভাবে বিশ্লেষণ পূর্বক যথাযথ নিদান ঘোষণা করাই বিচার সভার লক্ষ্য। এক্ষেত্রে বিচারক যে দুই পক্ষের মধ্যে ঘটা বিবাদের সমাধান করছেন, কেবলমাত্র সেই দুই পক্ষের প্রতি পক্ষপাতশূন্য অবস্থান গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বলাবাহুল্য পক্ষপাতশূণ্যতা কখনোই এরূপ দাবী করে না যে, যে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেই সকল অপরের স্বার্থকে সমান গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে।

গার্ট আরো বলেন পক্ষপাতরাহিত্যের অপর একটি প্রচলিত বৈশিষ্ট্য হল- ব্যক্তিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় ব্যক্তিগত পছন্দ এবং স্বার্থ ত্যাগ করে, পক্ষপাতশূন্য অবস্থান অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু তাঁর মতে নিরপেক্ষতাকে (Impartiality) ‘পক্ষপাতহীন’ (Unbiased) শব্দটির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার প্রবণতাটি বিভ্রান্তিকর। এই প্রসঙ্গে গার্ট একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। যথা- আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় খেলা বেসবল (Baseball)। ধরা যাক্ একজন আম্পায়ার ব্যক্তিগতভাবে কম রানের পরিবর্তে অধিক রান হয় এমন বেসবল খেলা বেশি পছন্দ করেন। তাই তিনি এমনভাবে খেলাটি পরিচালনা করলেন যার ফলে দুটি দলের বোলারদের তুলনায় ব্যাটসম্যানের বেশী সুবিধে হল এবং আম্পায়ারের নিজস্ব পছন্দ অনুসারে একটি অধিক

রানের খেলা সম্পন্ন হল। এইক্ষেত্রে কিন্তু উক্ত আম্পায়ার ব্যক্তিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন একটি নির্দিষ্ট দলের প্রতি কোন প্রকারের পক্ষপাত করেননি। তিনি তাঁর নিজস্ব পছন্দকে প্রাধান্য দিয়ে উচ্চ রান যুক্ত একটি খেলা উপস্থাপন করার উদ্দেশ্যে দুই দলের ব্যাটসম্যানদের কিঞ্চিত বেশী সুবিধা দিলেও, দুটি দলের প্রতিই তার নিরপেক্ষ অবস্থান অক্ষুন্ন থাকে।

অ্যারিস্টটলীয় সংজ্ঞানুসারে পক্ষপাতরাহিত্যের সর্বসম্মত বৈশিষ্ট্য হল- Like cases be treated alike অর্থাৎ একই রকম পরিস্থিতিতে একই ধরনের ব্যক্তি বা কর্তা বর্গের প্রতি একই ভাবে আচরণ করা। এই বৈশিষ্ট্যকে প্রায় সকল দার্শনিকগণই যথার্থ বলে গণ্য করেন। কিন্তু গার্টের ভাবনায় পক্ষপাতরাহিত্যের এই বৈশিষ্ট্যটি ভ্রান্ত। পক্ষপাতরাহিত্য (Impartiality) আর সামঞ্জস্য (Consistency) এক বিষয় নয় অর্থাৎ পক্ষপাতরহিত হওয়ার অর্থ ধারাবাহিকতা বজায় রাখা নয়। প্রসঙ্গ উল্লেখ না করে কোনও ব্যক্তিকে পক্ষপাতরহিত বলা হলে সেক্ষেত্রে অস্পষ্টতা থেকে যায়। ব্যক্তিটি কোন্ দলের বা কাদের প্রতি নিরপেক্ষ এবং কোন্ দলের বা কাদের সাপেক্ষে অপর দলটির প্রতি নিরপেক্ষ সেটি উল্লেখ করা জরুরি। গার্টের মতে পক্ষপাতরাহিত্যের ধারণা একটি অবস্থিত ধারণা। যেহেতু বৌদ্ধিকতার ন্যায় পক্ষপাতশূন্যতাও ব্যক্তির কর্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, সুতরাং বলা যায়- কোন ব্যক্তির পক্ষপাতশূন্য হওয়ার অর্থ, তার কৃত কর্মগুলি পক্ষপাতরহিত।

গার্ট দ্বারা প্রস্তাবিত পক্ষপাতশূন্যতার মৌলিক বা প্রাথমিক ধারণা বিষয়ক বিশ্লেষণটি নিম্ন প্রকার-

> "A is impartial in respect R with regard to group G if and only if A's actions in respect R are not influenced at all by which member(s) of G benefit or are harmed by these actions." [৩]

---

[৩] Gert, Bernard. *Morality: A New Justification of The Moral Rules,* Oxford University Press, 1988, p. 80.

ধরা যাক্ A ব্যক্তি, R বস্তু বিষয়ে G- গোষ্ঠীর প্রতি পক্ষপাতশূন্য হবেন যদি এবং কেবলমাত্র যদি, R নামক বিষয়ের অনুষঙ্গে A এর কর্ম, G- গোষ্ঠীর কোন্ সদস্য তার কর্ম দ্বারা লাভবান হবেন, আর কোন্ সদস্য ক্ষতিগ্রস্থ হবেন- এই বিষয়ক চিন্তা দ্বারা কোনভাবেই প্রভাবিত না হয়, অর্থাৎ R বস্তুকে কেন্দ্র করে, A নামক ব্যক্তির কাজটি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ- এই অর্থে যে তিনি উক্ত গোষ্ঠীর সদস্যদের লাভ-ক্ষতির দ্বারা কোনভাবেই প্রভাবিত না হয়ে কাজটি করছেন।

পক্ষপাতরাহিত্যের মৌলিক ধারণাটি বোধগম্য হলে তবেই নিরপেক্ষ আচরণ, মনোভাব বা পদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা করা সার্থক হবে। একজন ব্যক্তির আচরণ পদ্ধতিকে তখনই নিরপেক্ষ বলা যাবে যখন সেই ব্যক্তির চিন্তন, একটি দলের কোন্ সদস্য উপকৃত হয়েছে বা কোন্ সদস্যের ক্ষতি হয়েছে সেই বিষয়ক তথ্য দ্বারা প্রভাবিত হবে না। উক্তপ্রকারের মৌলিক ধারণা অনুসারে বলা যেতে পারে, কেবল নিরপেক্ষভাবে কাজ করার অর্থ নৈতিকভাবে কাজ করা নয়। একজন নৈতিক কর্তার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র পক্ষপাতশূন্য অবস্থান অবলম্বন করাই পর্যাপ্ত নয়, যথা- একজন বিচারক হয়তো কিছু অনৈতিক নিয়ম বা অনুশাসন প্রত্যেকের প্রতি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবেই ধার্য করলেন। তথাপি এই অনপেক্ষভাবে প্রযোজ্য অনৈতিক নিয়মাবলীকে কখনোই নৈতিকতার প্রেক্ষাপটে গ্রহণযোগ্য বলা যাবে না। একজন অত্যন্ত নিষ্ঠুর চরিত্রের ব্যক্তিও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হতে পারেন। গার্ট বলেছেন, আমরা অনেক ক্ষেত্রে বলে থাকি- ‘Cruel but impartial’, অর্থাৎ কোন একজন ব্যক্তি নির্দয় অথচ তিনি নিরপেক্ষ। এরূপ মন্তব্য করার কারণ হল, সাধারণত আমরা পক্ষপাতশূন্যতাকে একটি নৈতিকতার অনুকূল বা সহায়ক বৈশিষ্ট্যরূপে বিবেচনা করে থাকি। বাস্তবে ধরেই নেওয়া হয় যে ব্যক্তি অন্ততপক্ষে গ্রহণযোগ্য কার্যকলাপ প্রসঙ্গে পক্ষপাতশূন্য হবেন, যথা- আইন বা বিধি প্রণয়নের ক্ষেত্রে। কোনো একজন ব্যক্তি নিরপেক্ষভাবে কর্ম সম্পাদন করেছেন একথার অর্থ ধরেই নেওয়া হয় যে, ব্যক্তির যে কৃতকর্ম প্রসঙ্গে আলোচনা হচ্ছে সেই কার্যটি একটি নৈতিক শুভ কার্য। এক্ষেত্রে অনেকেই মনে করেন, যদি কার্যটি অশুভ হয় তাহলে

সেই কর্মটি নিষ্পন্ন হওয়ার সময় কর্তার পক্ষপাতশূন্য অবস্থান ছিল কিনা এই আলোচনা সম্পূর্ণ অমূলক। কারণ একটি অশুভ বা অহিতসাধক ক্রিয়া যতই নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে সম্পন্ন হয়ে থাকুক না কেন, সেই ক্রিয়া নৈতিকতার প্রেক্ষিতে প্রশংসিত হবে না। উদাহরণ স্বরূপ- নাৎসি বন্দীশালার একজন ভারপ্রাপ্ত অফিসার যদি সমস্ত বন্দীদের উপর সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে অত্যাচার করেন অর্থাৎ নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ, সুস্থ, অসুস্থ প্রভৃতি সমস্ত পরিস্থিতির ঊর্ধ্বে গিয়ে সব ধরনের পক্ষপাতমুক্ত হয়ে সকলের প্রতি সমান নির্মমভাবে অত্যাচার করেন, তাহলে এইপ্রকার নিরপেক্ষ আচরণকে কখনোই নৈতিক বলে গ্রহণ করা যায় না। বলাবাহুল্য উক্তপ্রকার পক্ষপাতশূন্য কার্যটি নৈতিক অর্থে ঘৃণ্য রূপেই তিরষ্কৃত হবে। ধরা যাক্ একজন বর্ণ বৈষম্যকারী ব্যক্তি একটি চাকরির শূন্য পদে লোক নিয়োগের দায়িত্ব পেয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি প্রার্থী চয়নের ক্ষেত্রে তাঁর স্বজাতীয় বা পছন্দের গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত আবেদনকারীদের মধ্যে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ অবস্থান অবলম্বন করে, একজন যোগ্য প্রার্থীকে সেই চাকরিতে নিয়োগ করলেন। তথাপি সেই ব্যক্তির এরূপ পক্ষপাতশূন্য নির্বাচনকে কখনোই নৈতিক বলে গ্রহণ করা যায় না। কারণ প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনি সকল আবেদনকারীদের সাপেক্ষে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করার পরিবর্তে, কেবলমাত্র তাঁর স্বজাতীয় আবেদনকারীদের মধ্যে পক্ষপাতশূন্য দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে প্রার্থী নির্বাচন করেছেন। সুতরাং গার্ট মনে করেন, নিরপেক্ষ হওয়ার অর্থ সর্বদা এই নয় যে একজন ব্যক্তি যে বিষয় বা গোষ্ঠীর প্রতি পক্ষপাতশূন্য আচরণ করেছেন, সেটি নৈতিক ভাবে গ্রহণযোগ্য হবে। পক্ষপাতরাহিত্য প্রসঙ্গে কাদের প্রতি এবং কাদের সাপেক্ষে নিরপেক্ষ আচরণ করা হচ্ছে, সেটি বিচার্য বিষয়। একজন ব্যক্তি যখন স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবেন যে কোন্ বিষয়ে বা কাদের প্রতি তিনি পক্ষপাতশূন্য অবস্থান অবলম্বন করেছেন এবং কাদের সাপেক্ষে তিনি নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছেন, তখনই বিচার করা সম্ভবপর হয় যে উক্ত ব্যক্তি যাদের সাপেক্ষে এবং যাদের প্রতি নিরপেক্ষ আচরণ করছেন, সেগুলি আদৌ গ্রহণযোগ্য কী না।

গার্টের মতে পক্ষপাতশূন্য অবস্থানটি প্রশংসনীয় কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধরে নেওয়া হয়, একজন ব্যক্তি যে গোষ্ঠীর প্রতি নিরপেক্ষ আচরণ করেছেন এবং যে গোষ্ঠীর সাপেক্ষে তিনি পূর্বোক্ত গোষ্ঠীর প্রতি এরূপ অবস্থান গ্রহণ করেছেন, নৈতিক প্রেক্ষাপটে উভয়ই যথার্থ এবং গ্রহণযোগ্য।

নিজের তুলনায় অপরকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা এক প্রকার নিরপেক্ষতার নিদর্শন। এবারে আমাদের বুঝে নেওয়া প্রয়োজন, গার্ট 'নৈতিক পক্ষপাতরাহিত্য' (Moral Impartiality) বলতে কি বুঝিয়েছেন। কোন একজন ব্যক্তি যে গোষ্ঠীর প্রতি পক্ষপাতরহিত হবেন, তিনি নিজেও সেই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। সেক্ষেত্রে দল বা গোষ্ঠীভুক্ত অন্যান্য সদস্যের তুলনায় নিজের প্রতি অধিক আনুকূল্য বা অনুগ্রহ তিনি দেখাতে পারেন না। প্রকৃত অর্থে যে নিরপেক্ষ সে নিজের প্রতিও নিরপেক্ষ। গার্টের মতে এইপ্রকার নিরপেক্ষতাই 'নৈতিক নিরপেক্ষতা'। কিন্তু সাধারণত ব্যক্তি জীবনের নিরপেক্ষতা প্রসঙ্গে এইরূপ নৈতিক নিরপেক্ষতার প্রয়োজন হয় না। ধরা যাক্, একজন পিতা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থেকে তার প্রত্যেকটি সন্তানকে সমান ভাগে অর্থ বন্টন করলেন অর্থাৎ প্রতিটি সন্তানকে সম পরিমাণে হাত-খরচের অর্থ প্রদান করলেন। কিন্তু সেই ব্যক্তি নিজের জন্য অধিক অর্থ রেখে দিলেন। এক্ষেত্রে সেই পিতা সন্তানদের তুলনায় অধিক পরিমাণে অর্থ নিজের খরচ বাবদ বরাদ্দ করলেও উক্ত ব্যক্তিকে সাপেক্ষ আচরণকারী বলা যাবে না, কারণ নিজের প্রতি করা আচরণ কখনোই তার প্রত্যেক সন্তানের প্রতি থাকা অনপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করবে না।

প্রাথমিকভাবে যেহেতু দার্শনিকগণ নৈতিক পক্ষপাতরাহিত্যের প্রতি আগ্রহী, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাই ধরেই নেওয়া হয় যে সকল প্রকার নিরপেক্ষতা দাবি করে, যে দল বা গোষ্ঠীর প্রতি নিরপেক্ষ আচরণ করতে হবে সেই গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যক্তি স্বয়ং অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। কিন্তু গার্টের ব্যাখায়, দার্শনিকগণের এরূপ পূর্বানুমান অযথার্থ। নৈতিক পক্ষপাতরাহিত্যের ক্ষেত্রে নিজেকে

গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা জরুরী ঠিকই, কিন্তু তার অর্থ এমন নয় যে ব্যক্তিকে সর্বদা নিজের ক্ষেত্রেও নিরপেক্ষ আচরণ করতে হবে। নৈতিক নিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজের প্রতিও সব রকম সাপেক্ষতা পরিত্যাগ করা আবশ্যক। কিন্তু এমন বলা চলে না যে সকল প্রকার নিরপেক্ষতার ক্ষেত্রেই নিজের প্রতি সাপেক্ষতা বর্জন করা জরুরী।

প্রতিটি ব্যক্তি বিবিধ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত থাকেন। নৈতিকতা কখনোই এমনটা দাবি করে না যে, একজন কর্তা যতগুলি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সেই সকল গোষ্ঠীর প্রতি তিনি পক্ষপাতশূন্য থাকতে বাধিত। যাঁরা নৈতিকতার একটি বিষয়গত ব্যাখ্যা দেন তাঁদের মতে, একজন যথার্থ নৈতিক কর্তা যে গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, নীতিবিদ্যা নিদেন পক্ষে সেই গোষ্ঠীর প্রতি পক্ষপাতশূন্য অবস্থান প্রত্যাশা করে। এক্ষেত্রে গার্ট তিন প্রকারের নৈতিক কর্তার উল্লেখ করেছেন, (১) যথার্থ (উপস্থিত) নৈতিক কর্তা (actual moral agents), (২) ভবিষ্যতের যথার্থ নৈতিক কর্তা (Future actual moral agents) এবং (৩) অস্তিত্বশীল সম্ভাব্য নৈতিক কর্তা (Existing potential moral agents)।[8]

এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন ধরনের মতামত পরিলক্ষিত হয়। কোন্ প্রকারের গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে নৈতিকতা নিরপেক্ষতা প্রত্যাশা করে সেই বিষয়ে দার্শনিক মতপার্থক্য বর্তমান। কেউ কেউ মনে করেন, কেবলমাত্র বর্তমানে বিদ্যমান যথার্থ নৈতিক কর্তাদের উক্ত প্রকার গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক। অনেকেই আবার ভবিষ্যতের বা পরবর্তীকালের যথার্থ নৈতিক কর্তাদেরও দলভুক্ত করার কথা বলে থাকেন। আবার কিছু নীতিতাত্ত্বিকের ব্যাখ্যায় নৈতিকতার ক্ষেত্রে যে গোষ্ঠীর প্রতি পক্ষপাতরহিত আচরণ প্রকাশিত হয়, সেই গোষ্ঠীতে সকল প্রকার অস্তিত্বশীল সম্ভাব্য নৈতিক কর্তাকেই অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ পাওয়া যায়। এমনকী কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভ্রুণ সহ সব ধরনের সম্ভাব্য নৈতিক কর্তা উপস্থিত এমন গোষ্ঠীর প্রতিও পক্ষপাতশূন্য আচরণ নৈতিক হিসেবে

[8] Gert, Bernard. "Moral Impartiality." *Midwest Studies in Philosophy* 20, 1995, pp. 104-106.

প্রস্তাবিত হয়। সেক্ষেত্রে আরেকদল বলেন, বর্তমানে উপস্থিত সকল অস্তিত্বশীল প্রাণী যাদের সুখ-দুঃখের অনুভূতি রয়েছে তাদের প্রত্যেকের অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজনীয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সম্ভাব্য নৈতিক কর্তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে গোষ্ঠীতে কারা কারা সংযোজিত হবেন এই প্রসঙ্গে নানা মতামত নীতিবিদ্‌গণের রয়েছে।

নৈতিকতার যথাযথ পরিধি কি এবং এর প্রয়োগ কোন ক্ষেত্রে কতখানি হওয়া প্রয়োজনীয়- এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে দার্শনিকগণ বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। এপ্রসঙ্গে গার্টের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী হল- দার্শনিক কোন যুক্তি বা তর্কের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান সম্ভবপর নয়। প্রায় সকল দার্শনিকরাই এবিষয়ে সহমত যে, যে গোষ্ঠীর প্রতি পক্ষপাতশূণ্য আচরণ প্রত্যাশা করা হবে অন্ততপক্ষে সকল অস্তিত্বশীল যথার্থ নৈতিক কর্তাকে সেই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। গার্ট এইপ্রকার গোষ্ঠীর নামকরণ করেছেন- ন্যূনতম গোষ্ঠী (Minimal Group) । তিনি বলেন অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে এই ন্যূনতম গোষ্ঠীটি বিস্তৃত হতেই পারে, তবে তাঁর যুক্তি সেক্ষেত্রে অবিকৃতই থাকবে।[৫]

নৈতিকতা পক্ষপাতরাহিত্য দাবি করে, এই মর্মে অধিকাংশ দার্শনিকরাই মনে করেন যে ব্যাক্তির সর্বদা পক্ষপাতশূণ্য থাকা বাঞ্ছনীয়। যদিও এর আবশ্যকতার স্থান, কারণ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁরা খুব বেশি আলোকপাত করেননি। ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে গোষ্ঠীর প্রতি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখার কথা বলা হবে সেই গোষ্ঠীটি যদি নৈতিক কর্তার ন্যূনতম গোষ্ঠীও হয়, তথাপি গার্ট মনে করেন একজন নৈতিক কর্তার পক্ষে মিনিমাল গ্রুপের প্রতিটি সদস্যের প্রতি সমানভাবে নিরপেক্ষ আচরণ করা বাস্তবে আদৌ সম্ভবপর নয়। ব্যক্তির পক্ষে ন্যূনতম গোষ্ঠীর সকল সদস্যের সুখ, দুঃখ, পছন্দ, আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির নিরিখে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা বাস্তবত অসম্ভব।

[৫] Gert, Bernard. 1988, pp. 83-90.

গার্ট উল্লেখ করেন, *Utilitarianism* -এর পঞ্চম অধ্যায়ে মিল প্রদত্ত পক্ষপাতরাহিত্য বিষয়ক বিবরণ তাঁর কাছে বাস্তব সম্মত এবং গ্রহণযোগ্য। মিল সেখানে স্পষ্টভাবে বলেছেন,

> "Impartiality where rights are concerned is of course obligatory, but this is involved in the more general obligation of giving to everyone his right." [৬]

অর্থাৎ যেক্ষেত্রে মানুষের অধিকারের প্রসঙ্গ আসে সেইক্ষেত্রে স্বভাবতই নিরপেক্ষতা বাধ্যতামূলক, কারণ প্রত্যেককে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা আবশ্যক। মিলের ব্যবহৃত 'অধিকার' অর্থাৎ 'Right' শব্দটিতে গার্ট আপত্তি প্রকাশ করেছেন, অধিকারের পরিবর্তে তিনি নৈতিক নিয়মের (Moral rules) কথা বলেন। নির্দিষ্ট কোন্ কোন্ ক্ষেত্রগুলিতে নৈতিকতা পক্ষপাতশূন্যতা দাবী করে তা বুঝতে হলে ব্যক্তির অধিকার বিষয়ে আলোচনার পরিবর্তে, নৈতিক অনুশাসন বিষয়ক আলোচনা করা প্রয়োজন। কাউকে হত্যা কোরো না (Do not Kill), কাউকে প্রতারণা কোরো না (Do not deceive)- এগুলি হল নৈতিক নিয়ম।

গার্টের ব্যাখ্যা অনুসারে- মিল দাবি করেছেন প্রত্যেক ব্যক্তিকে সর্বদা প্রত্যেক অপরের প্রতি আচরণ করার সময় নৈতিক নিয়ম বা অনুশাসনগুলি মান্য করে কর্ম করতে হবে। সুতরাং যখন ব্যক্তি কোন নৈতিক নিয়ম লঙ্ঘনকে বিবেচনা করবেন, সেইক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে নিরপেক্ষতার। কখনো যদি কোন ব্যক্তি অপর একজনকে সাহায্য করতে প্রবৃত্ত হন, অথচ সেই ব্যক্তিকে সাহায্য করা বা না করার সাথে কোনরূপ নীতি লঙ্ঘন করার সম্পর্ক নেই, তাহলে সেক্ষেত্রে পক্ষপাতশূণ্যতার কোনরূপ আবশ্যকতা নেই। অনুরূপভাবে গার্টও মনে করেন যদি

[৬] Mill, John Stuart. 2001, pp. 44-45.

নৈতিক অনুশাসন লঙ্ঘনের প্রশ্ন না ওঠে, তাহলে সেক্ষেত্রে পক্ষপাতশূণ্যতার অবস্থান অবলম্বনের আবশ্যকতা থাকে না।

গার্ট নীতিতন্ত্র এবং নীতিতত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কর্তার কী করণীয় সেটি নির্ধারণ করাই সাধারণত নীতিতন্ত্রের (Moral System) কাজ। যথার্থ শব্দ চয়নের মাধ্যমে বাক্য রচনার ক্ষেত্রে যেরূপে ব্যাকরণ পদ্ধতির প্রয়োজন হয়, একইভাবে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে যথার্থ নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কীরূপ কার্যসম্পাদন করা প্রয়োজনীয় তা নির্ধারণ করার জন্য নীতিতন্ত্র জরুরী। [৭]

অপরদিকে নীতিতত্ত্ব হল- নীতিতন্ত্রকে ব্যাখ্যা করা এবং সম্ভব হলে সেই পদ্ধতিকে যথার্থ প্রতিপন্ন করার একটি প্রয়াস। একটি ফলাফলমুখী নৈতিক তত্ত্ব কেবলমাত্র কর্মের ফলাফলকেই চূড়ান্ত মানদন্ড রূপে বিবেচনা করে থাকে। সুতরাং ফলাফলমুখী নীতিতত্ত্বে একটি ন্যায় পদ্ধতির যথার্থতা নিরূপনের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ফলাফলকেই বিবেচনা করা হয়।[৮] অপরদিকে কর্তব্যমুখী নীতিতত্ত্বে নৈতিক কর্মের নীতি ন্যায়-অন্যায় বিচারের প্রধান মানদন্ড। গার্ট বলেছেন ফলাফলমুখী তত্ত্ব বা কর্তব্যমুখী তত্ত্ব উভয় ক্ষেত্রেই নীতিতন্ত্র নিয়ে আলোচনা হলেও নৈতিক তত্ত্ব বিষয়ে কোনও কথা হয় না। নৈতিকতার স্বরূপ বিষয়ে ফলাফলমুখী নীতিবিদগণের স্বচ্ছ ধারণা না থাকায় সাধারণ নীতিতত্ত্বের তাঁরা মূল্য দিতে পারেননি।

এবারে ব্রিটিশ দার্শনিক জর্জ এডওয়ার্ড মুর (G.E. Moore, ১৮৭৩-১৯৫৮)- এর বক্তব্য বিষয়ে গার্টের ব্যাখ্যা আলোচনা করা যেতে পারে। মুরের বিশ্লেষণাত্মক দর্শন প্রসঙ্গে গার্ট প্রথমেই বলেছেন, বর্তমান শতাব্দীর নীতিদর্শনে যে বিভিন্ন প্রকারের বিভ্রান্তি বা দ্বন্দ্বগুলি উপস্থিত, তার

[৭] Gert, Bernard. 1995, pp. 106-108.

[৮] Gert, Bernard. "Rationality, Human Nature, and Lists." *Ethics* 100.2, 1990, pp. 279-300.

একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল- মুরের বক্তব্য। *Principia Ethica* গ্রন্থে মুর, ফলাফলমুখী নীতিতত্ত্বকে সমর্থন জানিয়েছেন। গার্ট নীতিতন্ত্র বলে যাকে চিহ্নিত করেছেন তার থেকে ভিন্ন এক প্রকার তত্ত্বের কথা মুর উল্লেখ করেছেন। তিনি এটিকে ‘ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা’ (Practical ethics) নামে অভিহিত করেছেন। মুরের মতানুসারে এই ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার কাজ হল “What ought we to do?” [৯] অর্থাৎ আমাদের কি করা উচিত বা কি করণীয়- এইরূপ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। মুরের ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা সাধারণত ব্যক্তির আচরণ কিরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়, সেই নির্দেশ প্রদান করে থাকে।

Principia Ethica গ্রন্থের “Ethics in Relation to conduct” নামাঙ্কিত অধ্যায়ে মুর বলেছেন,

> “The individual can therefore be confidently recommended always to confirm to rules which are both generally useful and generally practiced.”[১০]

অর্থাৎ ব্যক্তিকে সর্বদা সেই নিয়মগুলির পালন করার প্রস্তাব দেওয়া হয়, যে অনুশাসনগুলি সাধারণভাবে কার্যকরী এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেসকল নিয়মের অনুশীলন করা হয়ে থাকে। এরপরে মুর উক্তপ্রকার নিয়মগুলির ক্ষেত্রে একটি দৃঢ় কর্তব্যবাদের সূচনা করে বলেন এই নীতিগুলি অলঙ্ঘনীয় তথা সর্বজনীন। ফলাফলমুখী নীতিতত্ত্বের প্রস্তাব দিলেও মানুষের দ্বারা নৈতিক বিধি লঙ্ঘনের সম্ভাবনা স্মরণে রেখেই আশঙ্কা মুর নৈতিক পদ্ধতির ক্ষেত্রে চূড়ান্ত কর্তব্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করেন। যুগ যুগ ধরে নৈতিক বিধি গুলি সমর্থিত হওয়ার পাশাপাশি

---

[৯] Moore, G. E., "Ethics in Relation to Conduct." *Principia Ethica*, Cambridge University Press, 1903, p. 146.

[১০] Moore, G. E., 1903, p. 164.

মানুষের অপ্রতিরোধ্য পক্ষপাতের উপস্থিতি মুরকে এই সিদ্ধান্তে উপনিত করে যে, ব্যক্তি নিয়ম পালনে যে মাত্রায় কল্যাণ বা শুভ উৎপন্ন করতে পারে তার থেকে অনেক বেশী ক্ষতি বা অশুভ ফল উৎপন্ন করে নিয়মের লঙ্ঘন করে।

গার্টের ব্যাখ্যানুসারে, মুর ফলাফলমুখী নৈতিক তন্ত্রের তুলনায় ফলাফলধর্মী নৈতিক তত্ত্বকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। মুর বলেছেন সেইরূপ কার্য সম্পাদন করা সকল নৈতিক কর্তার কর্তব্য, যেরূপ কার্যের ফলে অধিক মাত্রায় শুভ উৎপন্ন হবে বা সর্বাধিক পরিমাণে হিত সাধন হবে। গার্ট মনে করেছেন, মুর সম্ভবত ফলাফলধর্মী নীতিতত্ত্বকেই মান্যতা দিয়েছেন, তবে নিঃসন্দেহে তাঁর বক্তব্যে অস্পষ্টতা রয়েছে। অপূর্ণ মানুষের ব্যবহারিক জীবনের পথ প্রদর্শক হিসেবে মুর তাঁর কর্তব্যবাদের পদ্ধতিকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। একাধারে তিনি বলেছেন, একটি অভ্রান্ত নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে মানুষকে সাধারণ ব্যবহারিক নৈতিক নীতিগুলির পালন করতে হবে। অপরদিকে তিনি বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তির নির্দিষ্ট একটি পরিস্থিতিতে উপলব্ধি হয় যে পূর্বে উল্লিখিত সাধারণ ন্যায্যতার নীতিগুলির মধ্যে যেকোনো একটি নীতি লঙ্ঘনের ফলে অধিক মঙ্গল সাধন সম্ভব, তবে সেইক্ষেত্রে ব্যক্তির দ্বারা নিয়মের লঙ্ঘন করাই কাম্য হবে। সুতরাং গার্টের মতে এইরূপ অসচ্ছতার মাধ্যমেই অনুভব করা সম্ভব যে মুরের ব্যাখ্যায় নৈতিকতার ধারণা বিষয়ক স্পষ্টতা অনুপস্থিত।

যদি কোন নৈতিকতায় মানব সাধ্যাতীত কিছু দাবি করা হয় তাহলে সেই প্রকার নৈতিকতা কখনোই উপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ রূপে গৃহিত হয় না। সুতরাং গার্টের ভাবনায়, নৈতিকতা একজন নৈতিক কর্তার থেকে শুধুমাত্র সেই পরিমাণে পক্ষপাতশূন্যতা দাবি করতে পারে, বাস্তবে যতখানি নিরপেক্ষ একজন ব্যক্তির পক্ষে একটি ন্যূনতম গোষ্ঠীর সদস্য রূপে হওয়া সম্ভব। কোন ফলাফলধর্মী নৈতিকতায় যদি দাবি করা হয়, ব্যক্তিকে নৈতিক পরিসরে এমন ভাবে পক্ষপাতরহিত দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করতে হবে যাতে ন্যূনতম গোষ্ঠীর প্রত্যেকের মঙ্গল সাধন হয়, তবে সেই

নৈতিকতা গার্টের মতে অপর্যাপ্ত। যদি কোন ফলাফলধর্মী নৈতিকতা দাবী করে নৈতিক কর্তাকে সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্য হয়ে ন্যূনতম গোষ্ঠীর প্রত্যেকের প্রতি শুভ ফলাফল উৎপাদক ক্রিয়া সম্পাদন করতে হবে, তবে সেই ন্যায়তন্ত্র যত ভালোই হোক না কেন সেটি অপর্যাপ্তই থাকবে, কারণ এইরূপ দাবী বাস্তবে পূরণ করা অসম্ভব। অপর দিকে গার্ট আরো বলেছেন, কিছু কিছু সাধারণ ও সার্বিক নিয়ম আছে যেগুলিকে মান্য করে চলা অপেক্ষাকৃত সহজ এবং ব্যক্তির নিজ আয়ত্তাধীন, যথা- হত্যা না করা, প্রবঞ্চনা না করা প্রভৃতি।

একটি যথার্থ ফলাফলমুখী ন্যায় পদ্ধতিতে যিনি নৈতিক অনুশাসনের প্রণেতা অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ঠ নিয়ম অনুসরণ করে ক্রিয়া সম্পন্ন হলে তার ফলাফল কিরূপ হতে পারে সেই প্রসঙ্গে উদ্বিগ্ন ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই শুধুমাত্র ন্যায্যতার নিয়মের বিষয়টি বিবেচিত হয়। ব্যক্তি যখন স্পষ্ঠ ভাবে বোধ করতে সক্ষম হবে যে নৈতিকতা কোন্ প্রেক্ষিতে বা কিসের সাপেক্ষে নিরপেক্ষ অবস্থান দাবী করে, তখনই তার উপলব্ধি হবে নীতি গুলি বাস্তবে পূরণীয় কি না। নৈতিক তন্ত্রে নীতির যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সেটিকে নিরপেক্ষতার মাধ্যমে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কিন্তু কিসের সাপেক্ষে এই নীতি বা নিয়মকে নিরপেক্ষভাবে পালন করা আবশ্যক, নীতিতত্ত্বে সেটির অবশ্য উল্লেখ থাকা প্রয়োজনীয় বলে গার্ট মনে করেন।

ফলাফলমুখী তাত্ত্বিকের ব্যাখ্যায়, নৈতিক প্রাঙ্গনে পক্ষপাতরহিত অবস্থান অবলম্বন প্রয়োজনীয় এইরূপ দাবী করার অর্থ এমন নয় যে নৈতিক কর্তাকে অপর সকলের হিত বিষয়ে সমমাত্রায় ভাবিত হতে হবে। কারা সুবিধাভোগি আর কারা ক্ষতিগ্রস্থ- সেই চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে, পক্ষপাতশূন্যভাবে অধিকতর শুভ ফলাফল উৎপাদক কার্য সম্পাদন করাই একজন যথার্থ নৈতিক কর্তার দায়িত্ব। অধিক মাত্রায় শুভ উৎপন্ন করার নীতিটিকে নিরপেক্ষ ভাবে পালন পূর্বক কার্য সম্পাদন করার ক্ষমতাই, নৈতিক পরিসরে কাঙ্খিত বলে ফলাফলমুখী তাত্ত্বিকের মত।

কিন্তু গার্ট মনে করেন, যদি কোন নীতি সম্পর্কে এরূপ দাবি করা হয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে কার্য সম্পাদন করার সময় সর্বদা সেই নীতির ব্যবহার করতে হবে, তাহলে সেটি হবে অবাস্তব এক দাবি। একজন যথার্থ নৈতিক কর্তার সেই নীতিটি অবলম্বন করে ক্রিয়া সম্পন্ন করা উচিত, যেই নীতি ব্যবহারের ফলে ব্যাপক মাত্রায় শুভ ফলাফল সৃষ্টি হয় । উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক, কোন একটি নির্দিষ্ট ধরনের দান ক্রিয়াকে যদি অনিবার্য নিয়ম হিসেবে সকলে পালন করে চলে তাহলে সেক্ষেত্রে নৈতিক ভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। যদি কোন ব্যক্তির পিতার মৃত্যু হৃদ্ রোগের কারণে হওয়ায় তিনি কেবলমাত্র হৃদ্‌যন্ত্র তহবিলেই দান করেন, অথচ সেক্ষেত্রে অপর কোনও প্রকারের দান ক্রিয়া সম্পন্ন করলে অধিক মাত্রায় শুভ ফলাফল উৎপন্ন হবে এই বিষয়ে তিনি অবগত, তাহলে সেক্ষেত্রে ব্যক্তির দান কার্যটিকে নৈতিক রূপে গণ্য করা যায় কি? মিল কিন্তু এই সর্বদা সর্বোচ্চ মাত্রায় শুভ ফলাফল উৎপাদনকারী নীতিটিকে নৈতিকতার সাধারণ দাবী হিসেবে গণ্য করেননি।

গার্টের মতে, ফলাফলধর্মী নীতি-তাত্ত্বিক এবং অধিকাংশ কর্তব্যমুখী নীতিবিদ (কান্ট, রলস) কোন্ বা কিসের সাপেক্ষে (কোন প্রেক্ষিতে) নৈতিকতা নিরপেক্ষতা দাবি করে- এই বিষয়টিকে গুরুত্ব সহযোগে বিবেচনা করেননি। কান্ট দুই প্রকার কর্তব্যের পার্থক্য করেছেন, যথা- পূর্ণ ব্যতিক্রমহীন কর্তব্য এবং অপূর্ণ কর্তব্য। কিন্তু এই ভেদ ব্যাখ্যা করার জন্য পক্ষপাতরাহিত্যের ধারণাকে কান্ট ব্যবহার করেননি। আবার রলস দুই ধরনের কর্তব্যের উল্লেখ করেছেন, যথা– সদর্থক কর্তব্য (Positive duties) এবং নঞর্থক কর্তব্য (Negative duties)।[১১] সমস্যাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে কেবল এই প্রকার কর্তব্যের পার্থক্য সৃষ্টি হতে পারে। যখন কোন একটি সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সদর্থক কর্তব্যের তুলনায় স্পষ্টত নঞর্থক

---

[১১] Rawls, John. *The Theory of Justice*, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1971, p. 114.

কর্তব্যের অধিক কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সেই নঞর্থক কর্তব্যকে নৈতিকভাবে অনুমোদনযোগ্য বলা হয়ে থাকে। রলসের কর্তব্য বিষয়ক আলোচনাতেও পক্ষপাতরাহিত্যের উল্লেখ নেই।

গার্ট নৈতিক অনুশাসন বা নিয়ম (Moral rules) এবং নৈতিক আদর্শ (Moral ideals) -এর মধ্যে পার্থক্য স্থাপন করেছেন। তাঁর মতে নৈতিক অনুশাসন সর্বদা পক্ষপাতশূন্য হয়ে পালন করা সম্ভবপর। একজন বৌদ্ধিক, নিরপেক্ষ ব্যক্তির আকাঙ্খা হবে প্রত্যেক কর্তা যেন সর্বদা নৈতিক নিয়ম এবং নৈতিক আদর্শ অনুসরণ করে চলেন। কিন্তু একজন নৈতিক কর্তা যদি নির্দিষ্ঠ পরিস্থিতিতে একটি বিশেষ নিয়ম পালনে ব্যার্থ হয়, তবে সেক্ষেত্রে ব্যক্তির সেই নিয়ম লঙ্ঘনের যথাযথ কারণ ব্যাখ্যা প্রত্যাশিত। গার্ট নিরপেক্ষভাবে নিয়ম পালন এবং নিয়মের ন্যায়সঙ্গত লঙ্ঘনকে সংগতিপূর্ণ বা সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। গার্টের ভাবনার সরলীকরণ করে বলা যেতে পারে, একজন যথার্থ নৈতিক কর্তার পক্ষপাতশূন্যভাবে সকল নৈতিক অনুশাসন পালন করাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কোনও পরিস্থিতিতে যদি তিনি নির্দিষ্ট একটি নিয়ম পালনে ব্যর্থ হন এবং সেক্ষেত্রে যদি ন্যায়সঙ্গত যুক্তি থাকে, তবে সেই ব্যক্তির উক্ত প্রকার নিয়ম লঙ্ঘনও নৈতিক পরিসরে গ্রহণযোগ্য হবে, অর্থাৎ এইরূপ ন্যায়সঙ্গত লঙ্ঘনকে নিরপেক্ষভাবে ন্যায্যতার নীতি পালনের তুলনীয় রূপে গণ্য করা হবে। গার্ট মনে করেন নৈতিকতার এইরূপ দাবি বাস্তবে মানব সাধ্যের অন্তর্গত। এই প্রসঙ্গে গার্ট দশটি নৈতিক নিয়মের উল্লেখ করেছেন। যথা- ১) হত্যা না করা, ২) কারোর দুঃখের বা যন্ত্রণার কারণ না হওয়া, ৩) অক্ষম না হওয়া, ৪) স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত না হওয়া, ৫) আনন্দ বা সুখ থেকে বঞ্চিত না করা, ৬) প্রতারণা না করা, ৭) প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকা, ৮) কাউকে না ঠকানো, ৯) অনুশাসন মেনে চলা, এবং ১০) নিজের কর্তব্য পালন করা।[১২]

[১২] Gert, Bernard. 1995, pp. 110-11.

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, এখানে ‘কর্তব্য’ কথাটিকে সাধারণ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ এখানে কর্তব্য পালন রূপ ক্রিয়াটি নির্দিষ্ট কিছু ভূমিকা এবং পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত। নৈতিক নিয়মকে মেনে চলা এবং অনপেক্ষভাবে সেগুলি পালন করা- এই দুটি বিষয় অভিন্ন নয়। গার্ট-এর ব্যাখ্যায় নৈতিক নিয়ম মান্য করার গূঢ়ার্থ হল, একটি নীতিকে কোনভাবে খণ্ডন না করে সেই নীতি অনুসারে কার্য সম্পাদন করা। অপরদিকে নিরপেক্ষভাবে নৈতিক নিয়ম পালন করার অর্থ- একটি নীতিকে লঙ্ঘন করার ফলে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর একজনের প্রতি অপরের তুলনায় অধিক সুবিধা জ্ঞাপন না করা হয় সেই বিষয়ে সচেতন থেকে ক্রিয়া সম্পন্ন করা। সুতরাং প্রথমে গার্ট বলেছেন, ব্যক্তিকে নৈতিক নিয়ম পালন করতেই হবে কারণ সেগুলি অলঙ্ঘনীয়। আবার দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন নৈতিক নিয়মগুলি পরিস্থিতি বিশেষে লঙ্ঘন সাপেক্ষ, কিন্তু সেক্ষেত্রে কর্তার সচেতন থাকা জরুরী, কোনভাবেই যেন এই লঙ্ঘনের দ্বারা একজন অপরের তুলনায় অধিক সুবিধা লাভ না করে। কারণ গার্ট পূর্বেও উল্লেখ করেছেন যে, ন্যায়সঙ্গতভাবে কোনও নীতির লঙ্ঘন ঘটলে তাকেও নিরপেক্ষভাবে নিয়ম পালনের সদৃশ ও সংগতিপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হবে। গার্টের মতে প্রকৃতপক্ষে নৈতিকতা শুধুমাত্র নৈতিক অনুশাসন পালনের ক্ষেত্রেই পক্ষপাতরহিত দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যাশা করে।

গার্ট আরও বলেন, নৈতিক আদর্শ (Moral ideals) অনুসরণ করার ক্ষেত্রে পক্ষপাতরাহিত্য আবশ্যিকরূপে গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেমন- ব্যথার উপশম কিংবা অক্ষমতা প্রতিরোধ প্রভৃতির ন্যায় নৈতিক আদর্শগুলি অনুসরণ করার ক্ষেত্রে কর্তার পক্ষপাতরহিত অবস্থান আশা করা কাম্য নয়। ন্যূনতম (লঘিষ্ঠ/ক্ষুদ্রতম) গোষ্ঠীভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি উক্তপ্রকার নৈতিক আদর্শগুলি নিরপেক্ষভাবে অনুসরণ করে কার্য করা কোন নৈতিক কর্তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। অগণিত মানুষের প্রত্যেকের প্রতি পক্ষপাতরাহিত্য বজায় রেখে নৈতিক আদর্শগুলি অনুসরণ করে চলা মানব সাধ্যের অতীত।

যদি কোনও ব্যক্তি কখনো কোনও নৈতিক নিয়ম লঙ্ঘন না করেন তাহলে তার অর্থ হল ব্যক্তিটি সেই নিয়ম গুলিকে নিরপেক্ষভাবে পালন করছেন। গার্ট বলেছেন অনেক ক্ষেত্রে এই নৈতিক নিয়ম গুলির মধ্যে পারস্পরিক সংঘাত লক্ষ্য করা যায় অর্থাৎ পরিস্থিতি বিশেষে নিয়মগুলি পরস্পর বিরুদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়, ফলে নৈতিক কর্তার মনে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং সেক্ষেত্রে নিদেন পক্ষে যে কোনও একটি নিয়মের লঙ্ঘন করা আবশ্যিক হয়ে পড়ে।

গার্টের মতে, নৈতিক আদর্শের সাথে যদি নৈতিক নিয়মের দ্বন্দ সৃষ্টি হয় তবে সেক্ষেত্রে নৈতিকতা রক্ষার তাগিদে বিশেষ নিয়মের লঙ্ঘন করেও নৈতিক আদর্শের অনুসরণ করাকে অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে। একজন নিরপেক্ষ বৌদ্ধিক ব্যক্তি, কোন বিশেষ ক্ষেত্রে নৈতিক আদর্শকে রক্ষা করার স্বার্থে কোন একটি ন্যায্যতার নিয়মের পালন নাও করতে পারেন। একটি প্রতিশ্রুতি বা প্রতিজ্ঞা রক্ষার পরিবর্তে একজনের প্রাণ রক্ষা করা অনেক বেশি জরুরী। নিরপেক্ষভাবে একটি নৈতিক নিয়মের পালন করা এবং বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে ন্যায়সঙ্গতভাবে সেই নিয়মের লঙ্ঘন করাকে গার্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ হিসেবে দেখেছেন।

আরো নির্দিষ্টরূপে বলা যায় যে, অনপেক্ষভাবে একটি নৈতিক নিয়মের পালন করার অর্থ বুঝতে হলে, সেই নির্দিষ্ট পদ্ধতিকে বুঝতে হবে যার সাহায্যে কোন একটি নৈতিক অনুশাসনের পালন অথবা লঙ্ঘনকে নৈতিক পরিসরে গ্রহণযোগ্য বলে নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করা যায়।

নৈতিক নিয়ম মেনে চলার ক্ষেত্রে পক্ষপাতশূন্যতা প্রয়োজনীয়। কিন্তু এই দাবীটি স্বীকার করে নিলেও এই বিতর্কের সমাধান হয় না যে, তথ্যগত তারতম্য না থাকলেও ব্যাক্তি বিশেষের মধ্যে নৈতিক চিন্তন, মূল্যবোধ বা নৈতিক মতাদর্শগত ভেদ থাকতেই পারে যা নৈতিক সমদর্শিতা দ্বারাও দূর হয় না। এবারে জিজ্ঞাস্য হল- নৈতিক প্রেক্ষাপটে এইপ্রকার মতপার্থক্যগুলিকে কী পক্ষপাতরাহিত্যের সাহায্যে দূর করা সম্ভব? গোষ্ঠীভুক্ত কোন্ সদস্য উপকৃত বা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন

সেই চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে নৈতিক অনুশাসনগুলি পালন করতে পারাই হল সঠিক অর্থে পক্ষপাতরহিত হওয়া। গোষ্ঠীর কোন্ সদস্য লাভবান হবেন আর কোন সদস্যের অনিষ্ট সাধন হবে- এই বিষয়ের দ্বারা যাতে নৈতিক কর্তা নিয়ম পালনের সময় কোনভাবেই প্রভাবিত না হয়ে পড়েন তা নিশ্চিত করার উপযুক্ত উপায় হল, এই নিয়ম লঙ্ঘনের দ্বারা কারা উপকৃত হবেন আর কারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, সেই বিষয়ে কর্তাকে কোনও তথ্য না দেওয়া।[১৩]

রলস তাঁর তত্ত্বে অজ্ঞতার আবরণের (Viel of ignorance) উল্লেখের মাধ্যমে, কোন্ কোন্ ন্যায্যতার নীতিগুলি পালন করা একজন যথার্থ বৌদ্ধিক, নিরপেক্ষ নৈতিক কর্তার কর্তব্য তার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু প্রতিটি নীতির যথাযথ ও নিরপেক্ষ প্রয়োগের পদ্ধতি বিষয়ে রলস বিশেষ আলোকপাত করেননি। সকল সমদর্শী, বৌদ্ধিক মানুষ কি প্রকার নিয়ম-বিধি অনুসরণ করবেন তা নিশ্চিত করার স্বার্থেই রলস প্রাথমিকভাবে অজ্ঞতার আবরণের উল্লেখ করেছিলেন। রলস-এর মতে, ব্যক্তির নিজস্ব ধ্যান-ধারণার দ্বারা প্রণোদিত হয়ে নৈতিক সিদ্ধান্ত গৃহিত হলে সেক্ষেত্রে ভিন্নতা ও বিরোধ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রতিটি ব্যক্তির নৈতিক বোধ এবং বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যন্যতা রয়েছে যেগুলি নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির বিচারের সামর্থকে ক্ষুন্ন করে।

রলস-এর এই অজ্ঞতার আবরণের চিন্তন পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান তথা সব ধরনের বিজ্ঞান কাজ করতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে শর্ত হল ব্যক্তি এমন কোন জ্ঞান ব্যবহার করতে পারবেন না, যার দ্বারা তিনি নিজেকে অপরের থেকে পৃথক অনুভব করবেন। নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও কর্তা কোনোভাবেই নিজ স্বভাব দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন না, কারণ সেক্ষেত্রে অপর একজন যে নৈতিক সিদ্ধান্তের প্রস্তাব দিয়েছে, তার থেকে ভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত

---

[১৩] Gert, Bernard. 1988, pp. 141-45.

গ্রহণের সম্ভাবনা থেকে যায়। অতএব অজ্ঞতার আবরণের ধারণাকে কাজে লাগিয়ে, নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অভিন্নতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। রলস্-এর বক্তব্য হল আরম্ভ স্থলে উপস্থিত কোন একজন পক্ষপাতশূন্য বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি, তার নিজ দৃষ্টিকোণ অনুসারে সকলের হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।[১৪] কিন্তু গার্ট মনে করেন, রলস-এর এইপ্রকার শর্তাবলী উক্ত পদ্ধতিটিকে সম্পূর্ণরূপে অকার্যকরি এবং অনুপযোগী করে তুলেছে। বৌদ্ধিক মানুষের ব্যক্তিত্ব, স্বভাব, শুভাশুভের (শুভ-অশুভের) ধারণাগুলি পৃথক পৃথক হয়ে থাকে বলে তিনি রলস-এর এই অজ্ঞতার আবরণের ধারণাটিকে খন্ডন করেন। তাঁর মতে রলস-এর এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সকল নিরপেক্ষ, বৌদ্ধিক মানুষের মধ্যে ঐক্য মত স্থাপনের দাবিটি অবাস্তব ও অসম্ভব।

লৌকিক তন্ত্র হিসেবে নৈতিকতা: নৈতিক নিয়মকে নিরপেক্ষ, নৈব্যক্তিকভাবে পালন করার ক্ষেত্রে পক্ষপাতরাহিত্য আবশ্যক। অন্ততপক্ষে নূনতম গোষ্ঠীর প্রতি ন্যায্যতার নীতি পালনের ক্ষেত্রে নৈতিকতা পক্ষপাতরাহিত্য প্রত্যাশা করে থাকে। কিন্তু গার্ট মনে করেন নিশ্চিত রূপে নিরপেক্ষ অবস্থান অবলম্বন করে নৈতিক নিয়ম পালনের যথাযথ কোন পদ্ধতির উল্লেখ পাওয়া যায় না। তিনি দাবি করেন নৈতিক পরিসরে এমন একটি পদ্ধতি আবশ্যক যেটি বাস্তব জগতে মানুষের ব্যবহার উপযোগী হবে এবং কোন একটি নির্দিষ্ট নিয়ম লঙ্ঘন, নিরপেক্ষভাবে নীতি পালনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কীনা তা বিচার করতে সক্ষম হবে। এরপরে গার্ট বলেছেন, নৈতিকতায় কী প্রকারের পক্ষপাতশূন্যতা প্রয়োজনীয়, সেটি বোধগম্য করার জন্য শুধুমাত্র পক্ষপাতরাহিত্যের মৌলিক ধারণার বিশ্লেষণ করাই যথেষ্ট নয়। এক্ষেত্রে নৈতিকতার আদর্শ বিষয়েও একটি পর্যাপ্ত এবং যথাযথ ব্যাখ্যা আবশ্যক। যেহেতু নৈতিকতা এমন একটি সর্বসাধারণের ব্যবস্থা যেটি প্রত্যেক নৈতিক কর্তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সেহেতু ব্যক্তির এটি বোধ

[১৪] Rawls, John. 1971, p. 139.

করা অত্যন্ত জরুরী যে লৌকিক তন্ত্র বলতে ঠিক কি বোঝায়, আর এটিকে সকল নৈতিক কর্তার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার অর্থই বা কি।

লৌকিক তন্ত্র (Public System) হল এমন একটি পরিচালনা পদ্ধতি, যে পদ্ধতিটিকে যাদের ওপর প্রয়োগ করা হয় কেবল তারাই এটির কার্যকারিতা বুঝতে সক্ষম হন। সর্বসাধারণের পদ্ধতির একটি অনবদ্য দৃষ্টান্ত হল– ক্রীড়া (খেলা)। সাধারণ পরিস্থিতিতে ক্রীড়া হল এমন একটি পরিচালনা প্রণালী যা ক্রীড়ায় অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা জ্ঞাত এবং উপলব্ধ হয়ে থাকে। সাধারণত কোন একটি নির্দিষ্ট ক্রীড়ায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক খেলোয়াড়, সেই খেলায় অনুমোদনযোগ্য নিয়মাবলী, নিষিদ্ধ আচরণ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সম্পর্কে অবগত থাকেন। সুতরাং সেই নির্দিষ্ট প্রণালী দ্বারা অনুমোদিত নিয়মাবলী অনুসারে নিজের এবং অপরের আচরণকে পরিচালনা করা একজন খেলোয়াড়ের পক্ষে অযৌক্তিক নয়। লৌকিক তন্ত্র বা পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হল যাদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়েছে, তারা প্রত্যেকেই উক্ত প্রণালী সম্পর্কে সামগ্রিক রূপে অবগত থাকেন।

'নৈতিক কর্তা' বলতে বোঝানো হয়- সেই সকল বৌদ্ধিক ব্যক্তিদের, যাদের মধ্যে নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান পর্যাপ্তমাত্রায় উপস্থিত, এবং যাঁরা নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাকৃত কর্ম সম্পাদনে শারীরিকভাবে সক্ষম। নৈতিকতাকে যদি সর্বসাধারণের জন্য সৃষ্ট ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করা হয়, এবং যদি সকল নৈতিক কর্তার ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থাটি কার্যকর হয়, তাহলে তার অর্থ হল- প্রত্যেক নৈতিক কর্তাকে, কেবলমাত্র নিজস্ব ব্যবহারকেই বৌদ্ধিকভাবে পরিচালনা করতে হবে এমন নয়, তাছাড়াও অপর সকল নৈতিক কর্তার আচরণকেও বৌদ্ধিকভাবে যথার্থ রূপে পরিচালনা করতে হবে। সুতরাং এর থেকে অনায়াসেই বলা যায় যে, অপর নৈতিক কর্তাদের আচরণকে নৈতিকতার প্রেক্ষিতে বিচার করার জন্য নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলির সম্পর্কে কর্তার ওয়াকিবহাল থাকা আবশ্যক। যথা - নৈতিকতা কী দাবী করে, কী

কী নিষেধাজ্ঞা এক্ষেত্রে বর্তমান, এবং কোন্ কোন্ বিষয়গুলিকে, নৈতিকতায় অনুমোদন এবং উৎসাহ প্রদান করা হয় – সেই সম্পর্কে নৈতিক কর্তার অবগত হওয়া জরুরী।

নৈতিকতা যদি একটি লৌকিক তন্ত্র হয় তাহলে যে যে নৈতিক বিধান গুলি একজন নৈতিক কর্তা অপরের জন্য অনুমোদন করবেন, সেই একই বিধিনিষেধ তার নিজের উপরও লাঘব হবে। সুতরাং নৈতিকতাকে একটি লৌকিক তন্ত্র হিসেবে গ্রাহ্য করা হলে, একই নৈতিক অনুশাসন স্বয়ং কর্তা এবং অপর সকলের প্রতি প্রযোজ্য হবে। গার্টের মতে নৈতিকতা বিষয়ক উক্ত প্রকারের ধারণাটি কান্ট, রলস, হবস, হিউম, বায়ার প্রভৃতি দার্শনিকগণ পোষণ করে থাকেন। কেবলমাত্র কিছু ফলাফলমুখী নীতিতত্ত্বে ভিন্নভাবে নৈতিকতাকে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে বলা হয় নৈতিকতাকে লৌকিক তন্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা অপ্রয়োজনীয়।

ফলাফলমুখী নৈতিকতার বিরোধিতা করে অনেকে বলে থাকেন এই প্রকার নীতিতত্ত্বে এমন কিছু কর্ম বা সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করা হয়ে থাকে যেগুলি স্পষ্টতই লৌকিক তন্ত্র হিসেবে নৈতিকতার ধারণার সহিত সম্পূর্ণ অসঙ্গত বা বেমানান। যাঁরা ফলাফলমুখী তত্ত্বের সমর্থক, তাঁরা কোন কার্যের ফলাফলের নিরিখে সেই কার্যের ন্যায্যতা বা অন্যায্যতা স্থির করেন। ধরা যাক কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে, ফলাফলমুখী তাত্ত্বিকরা পরীক্ষায় অসৎ উপায় অবলম্বন করাকেও গ্রহণযোগ্য হিসেবে ধার্য করতে পারেন। যদি কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা কর্তা ন্যায়সঙ্গতভাবে বিশ্বাস করেন যে এইক্ষেত্রে পরীক্ষায় নকল বা অসৎ পথ অবলম্বন করলে অধিক ভালো ফল উৎপন্ন হবে কারণ, প্রথমত- এক্ষেত্রে সে নিশ্চিত যে পরীক্ষক দ্বারা সে ধৃত হবে না, দ্বিতীয়ত- আপাত ভাবে সেই জ্ঞানার্জন না হলেও অজ্ঞতার দরুণ তার ভবিষ্যতে কোন খারাপ ফলাফল হবেনা, এবং সর্বশেষে- সে যদি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হতে পারে, তাহলে তার অভিভাবকগণ মর্মাহত হবেন। কিন্তু নকল করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে উক্ত প্রকার প্রতিকূলতা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। অতএব বলা বাহুল্য, ফলাফলমুখী তত্ত্বের বিরোধীরা উক্ত প্রকার উদাহরণের উল্লেখের মাধ্যমে, এই প্রকার

তত্ত্বের নৈতিক ধারণার তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং বোঝাতে চেয়েছেন যে নৈতিকতাকে লৌকিক তন্ত্র হিসেবে গ্রহণ না করে, ফলাফলের ভিত্তিতে নৈতিক বিধি-নিষেধ ধার্য করার অর্থ হল, নানা প্রকারের অনায্য কার্যকে নৈতিক প্রেক্ষিতে অনুমোদন দেওয়া। একজন পক্ষপাতরহিত বৌদ্ধিক ব্যক্তি (impartial rational person) নৈতিকতাকে লৌকিক তন্ত্র হিসেবে ধার্য করে যে নৈতিক সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করেন, সেই ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্তগুলির বিরুদ্ধ নৈতিক সিদ্ধান্তকেও অনেক ক্ষেত্রেই ফলাফলমুখী তাত্ত্বিকরা অনুমোদনযোগ্য বলে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রেই তাদের অনুমোদিত সিদ্ধান্তগুলি, বৌদ্ধিক নিরপেক্ষ নৈতিক কর্তার সিদ্ধান্তগুলির সহিত অসংগতিপূর্ণ হয়ে থাকে। গার্ট মনে করেন, নৈতিকতাকে লৌকিক তন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করে সকল নৈতিক কর্তার প্রতি সেটিকে প্রয়োগ করা প্রয়োজন, কারণ নৈতিকতা নিছকই একটি প্রচলিত ধারণা নয়, এটি একটি সর্বজনীন পদ্ধতি যার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রত্যেক নৈতিক কর্তার জীবনে উপস্থিত। নৈতিকতা কেবলমাত্র প্রতিটি সমাজব্যবস্থার প্রথা বা অভ্যাসের উপর নির্ভরশীল একটি পদ্ধতি নয়। গার্ট বলেন, আমরা প্রত্যাশা করি যে নৈতিক কর্তার অভ্যাসের ভিত্তিতে কিছু নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যথাযথ হবে। আর সেই ন্যায্যতা বিষয়ক সিদ্ধান্ত গুলি সকল সামাজিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। কিন্তু নৈতিকতার আদর্শকে একটি লৌকিক তন্ত্র হিসেবে ব্যাখ্যা করা না হলে, উক্তপ্রকার দাবি পূরণ করা সম্ভবপর হবে না।

গার্ট আরো বলেন, নৈতিকতার জন্য যে পক্ষপাতশূন্য অবস্থা প্রয়োজন সেই পক্ষপাতশূন্যতাকে লৌকিক পদ্ধতির অংশ হতে হবে। একটি লৌকিক তন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হল সেই পদ্ধতি অবলম্বনকারীদের প্রতি অযৌক্তিক (irrational) না হওয়া, অর্থাৎ এই পদ্ধতি পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৌদ্ধিক আচরণ করা। সুতরাং একটি নৈতিক পদ্ধতির শর্ত বা বিধি-নিষেধগুলি যাঁরা পালন করবেন, সেইসকল নৈতিক কর্তার প্রতিও কোনরূপ অযৌক্তিক ব্যবহার গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, গার্টের মতে নৈতিকতাকে একটি লৌকিক তন্ত্র

হিসেবে ব্যাখ্যা করতে হবে। এক্ষেত্রে নৈতিকতার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি বাস্তবায়িত করা মনুষ্য সাধ্যের অন্তর্গত হয়ে থাকে। নিরপেক্ষতা যেহেতু নৈতিকতার ক্ষেত্রে একটি প্রয়োজনীয় দাবী, সেহেতু প্রত্যেক নৈতিক কর্তার থেকে এমনভাবে পক্ষপাতরহিত অবস্থান প্রত্যাশা করা হবে যাতে সেটি মানব সাধ্যের অতীত না হয়। কোন নীতিকে পক্ষপাতরহিতভাবে পালন করার অর্থ হল- প্রত্যেক নৈতিক কর্তা যখন সেই নীতি লঙ্ঘনের সিদ্ধান্তকে যথার্থ বলে বিচার করবেন, তখন সকল নৈতিক কর্তাই যেন সেই একই প্রকারের লঙ্ঘনকে অনুমোদন করে। প্রত্যেক নৈতিক কর্তা যদি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে একই প্রকারের নিয়ম লঙ্ঘন করে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে উক্ত লঙ্ঘনটিও নিরপেক্ষভাবে নিয়ম পালনের সমতুল্য হয়ে উঠবে।

এবারে গার্ট বলেছেন, যে বৈশিষ্ট্যগুলির সাহায্যে নির্ধারণ করা যায় যে কোনগুলি একই প্রকারের নীতি লঙ্ঘন, সেই বৈশিষ্ট্যগুলিকে বলা হবে নৈতিকতার প্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ট্য (The morally relevant features)। যেহেতু নৈতিক পদ্ধতি একটি লৌকিক তন্ত্র যা প্রতিটি নৈতিক কর্তার উপর প্রযোজ্য, আর যেহেতু উক্তপ্রকারের নৈতিকতার সহিত প্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ট্যগুলিও এই লৌকিক নৈতিক পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং নৈতিক পরিসরে প্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ঠ্যগুলিও সকল ন্যায় কর্তার দ্বারা জ্ঞাত হবে।[১৫]

পরিশেষে উক্ত আলোচনার আলোকে গার্টের ভাবনা বিষয়ক কিছু দাবী উপস্থাপন করা যেতে পারে। (ভাবনার একটি সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা যেতে পারে)। গার্টের মতে নৈতিকতার অনুজ্ঞা অনুযায়ী, একজন যথার্থ নৈতিক কর্তার ন্যূনতম গোষ্ঠীর (যে গোষ্ঠীতে ব্যক্তি নিজেও অন্তর্ভুক্ত) প্রতি নিরপেক্ষ আচরণ করা বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে ব্যক্তি কেবলমাত্র নিজেকে এবং বর্তমানে অস্তিত্বশীল নৈতিক কর্তাদের গোষ্ঠীভুক্ত না করে, সমস্ত ভবিষ্যতের নৈতিক কর্তাদেরকেও দলভুক্ত

---

[১৫] Gert, Bernard. 1995, pp. 114-17.

করবেন। আবার অপর একদল দাবি করতে পারেন, ব্যক্তিকে যে গোষ্ঠীর প্রতি নিরপেক্ষ অবস্থান অবলম্বন করতে হবে সেই গোষ্ঠীতে ভবিষ্যতের সমস্ত বোধ সম্পন্ন জীবিত সত্তা এবং সমস্ত সম্ভাব্য নৈতিক কর্তা অর্থাৎ যারা ভবিষ্যতে নৈতিক কর্তা হয়ে উঠতে পারেন, (যথা- ভ্রূণকে) তাদেরও অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক। গার্ট এইরূপ বাদানুবাদের প্রসঙ্গকে এড়িয়ে গিয়ে বলেছেন,

> " I have offered no arguments to resolve this dispute and, infact, do not know of any argument that would result in any agreement. "[১৬]

গার্ট অনুসারে নৈতিকতার পরিসরে দাবী করা হয় একজন ব্যক্তি কোনো একটি গোষ্ঠীর সাপেক্ষে এবং সেই গোষ্ঠীর কোনো একটি বিষয়ে নিরপেক্ষতা বজায় রাখবেন। নৈতিকতার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ অবস্থান দাবী করার অর্থ এরূপ নয় যে, ব্যক্তিকে সকলের প্রতি এবং সমস্ত প্রকার ক্ষেত্র নির্বিশেষে নিরপেক্ষ আচরণ করতে হবে। কোন্ গোষ্ঠীর প্রতি এবং কোন্ ক্ষেত্রে কর্তাকে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে কার্য করতে হবে তা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেওয়া কাম্য।

গার্ট নৈতিকতার প্রেক্ষিতে দুটি বিষয়ের উল্লেখ করেন, যথা- নৈতিক আদর্শ এবং নৈতিক অনুশাসন। তাঁর মতে নৈতিক পরিসরে, নৈতিক অনুশাসন পালন করার ক্ষেত্রে কর্তার পক্ষপাতরহিত অবস্থান প্রত্যাশা করা হয়। একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর প্রতি নৈতিক অনুশাসন পালন করার ক্ষেত্রে, একজন যথার্থ নৈতিক কর্তার সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ আচরণ করা আবশ্যক। কিন্তু কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে যদি ব্যক্তি নির্দিষ্ট একটি নৈতিক অনুশাসন পালন করতে অসমর্থ হন এবং সেই নিয়মের লঙ্ঘনটি যদি ন্যায়সঙ্গত (justified) কারণে হয়ে থাকে, তাহলে উক্তপ্রকার লঙ্ঘনকেও নিরপেক্ষভাবে নিয়ম পালনের সমকক্ষ হিসেবে ধার্য করা হবে। এরপর

[১৬] Gert, Bernard. 1995, p. 122.

গার্ট বলেছেন, নৈতিক নিয়ম বা অনুশাসনের ক্ষেত্রে কর্তার নিরপেক্ষ অবস্থান কাম্য হলেও, নৈতিক আদর্শগুলি অনুসরণ করার ক্ষেত্রে ব্যক্তির থেকে নিরপেক্ষতা প্রত্যাশা করা অনাবশ্যক। তিনি মনে করেন, নৈতিক অনুশাসন গুলিকে যদি একজন যথার্থ নৈতিক কর্তা নিষেধাজ্ঞা রূপে গ্রহণ করেন, তাহলে এই নিয়ম গুলিকে পক্ষপাতরহিত রূপে পালন করা ব্যক্তির পক্ষে অনায়াসেই সম্ভবপর।

গার্টের ব্যাখ্যায়, নৈতিকতা হল এমন একটি লৌকিক তন্ত্র বা ব্যবস্থা যেটি সমস্ত নৈতিক কর্তার উপরেই সমান রূপে বর্তায়। নৈতিকতার প্রেক্ষিতে যে ধরনের নিরপেক্ষতা প্রয়োজনীয়, সেই অনপেক্ষতা অবশ্যই একটি লৌকিক তন্ত্রের অংশ হবে। তিনি কট্টর নীতিবাদের বিরোধী হলেও এক প্রকার সাধারণ নৈতিকতার দাবী করেন যা সমগ্র মানব প্রকৃতিকে সমরূপী বলে অভিহিত করে। স্বরূপত সকল মানুষ প্রজ্ঞার অধিকারী হলেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে নীতির অমিল এবং মতানৈক্য থাকাটাই স্বাভাবিক। গার্টের মত অনুযায়ী সাধারণ নৈতিকতা যদি নৈতিক কাঠামো হয়, তবে তা হবে পরিবর্তনশীল। সাধারণ নৈতিকতার অন্তত পক্ষে চারটি সম্ভাব্য মতবিরোধ আছে বলে তাঁর অভিমত- (১) কে এই নৈতিকতার বিবেচনার যোগ্য- তা বিবেচ্য হবে, (২) কর্তার বিভিন্ন ক্ষতির নানান প্রকার গুরুত্ব আরোপিত হতে পারে, (৩) ব্যক্তি ভেদে একই কাজের ক্ষতিকারক ফলাফল বিচিত্র রূপে দেখা যেতে পারে, (৪) একটি নৈতিক নিয়মের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যান দেওয়া হতে পারে। গার্টের মতে যে নীতি তন্ত্রে সাধারণ নৈতিকতা অন্তর্ভুক্ত, তার ক্ষেত্রে কর্তা নৈতিক নিয়ম, নৈতিক আদর্শ এবং দুই ধাপ বিশিষ্ট সজ্ঞামূলক প্রক্রিয়া সহযোগে বিচার করেন আদৌ কোনও বিশেষ নৈতিক নিয়ম অথবা লঙ্ঘন ন্যায্য কি না। তাঁর উল্লিখিত দশটি নিয়ম বাস্তবে দুটি নিয়মের অন্তর্ভুক্ত; প্রথমটি "কারো ক্ষতি না করা" এবং দ্বিতীয়টি "কারো বিশ্বাস ভঙ্গ না করা"। তিনি আদর্শকে নিয়মের তুলনায় দুর্বল বলে মনে করেছেন।

গার্ট বলেছেন, নৈতিক অনুশাসনগুলিকে পক্ষপাতশূন্যভাবে পালন করার অর্থ হল- কর্তাকে এই নিয়মগুলিকে সর্বদা মান্য করতে হবে। যদি একজন বৌদ্ধিক ব্যক্তি (rational person) নির্দিষ্ট কোনও পরিস্থিতিতে একটি নির্দিষ্ট নৈতিক নিয়মের লঙ্ঘনকে সর্বসমক্ষে মান্যতা দেন, শুধুমাত্র তবেই সেক্ষেত্রে নিয়মভঙ্গ করাকে নৈতিকতার পরিসরে অনুমোদন দেওয়া হবে। বৌদ্ধিক ব্যক্তি দ্বারা অনুমোদিত উক্তপ্রকার লঙ্ঘন এবং পক্ষপাতশূন্যরূপে নৈতিক অনুশাসন পালনকে গার্ট অভিন্ন হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্ট করতে চেয়েছেন যে, কোন একজন নির্দিষ্ট বৌদ্ধিক ব্যক্তির দ্বারা অনুমোদিত নিয়ম লঙ্ঘনকেই সার্বিকভাবে গ্রহণযোগ্য বলা যায় না। শুধুমাত্র তখনই কোনও নৈতিক অনুশাসন লঙ্ঘন এবং পক্ষপাতরহিত ভাবে নিয়ম পালনকে সমকোটিতে ধার্য করা হবে, যখন একটি নৈতিক লৌকিক তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত বৌদ্ধিক ব্যক্তি সেই নির্দিষ্ট নিয়ম লঙ্ঘনকে ন্যায়সঙ্গত রূপে মান্যতা দেবেন। এইপ্রকার লঙ্ঘন গুলি গার্টের ভাষায়, "Strongly justified violations" অর্থাৎ জোড়ালো যুক্তিসম্পন্ন লঙ্ঘন। আবার যখন কোনও একটি নিয়ম লৌকিকভাবে লঙ্ঘনীয় কিনা এই বিষয়ে বৌদ্ধিক কর্তার মধ্যে মতপার্থক্যের উদ্ভব হয়, সেই পরিস্থিতিতে ব্যক্তি নিরপেক্ষ অবস্থানে থেকে নিয়মের পালন অথবা লঙ্ঘন করতেই পারে। যেহেতু এইপ্রকার পরিস্থিতিতে নৈতিক অনুশাসন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে বৌদ্ধিক কর্তার মধ্যে মতবিভেদ দেখা যায়, তাই গার্টের ভাষায় এই লঙ্ঘনকে বলা হয় " Weakly justified violations" অর্থাৎ দুর্বল যুক্তিপূর্ণ লঙ্ঘন।[১৭]

সর্বোপরি বলা যায়, গার্ট পক্ষপাতরাহিত্য বিষয়ে একটি বস্তুগত বা বিষয়গত ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যার সাহায্যে নৈতিক অনুশাসনের ন্যায্য বা যুক্তিপূর্ণ এবং অনায্য অর্থাৎ যুক্তিসঙ্গত নয় এরূপ, উভয় প্রকার লঙ্ঘনকেই যথাযথ রূপে বিবৃত করা হয়েছে। গার্ট প্রদত্ত নৈতিক

[১৭] Gert, Bernard. 1995, p. 123.

পক্ষপাতরাহিত্যের ব্যাখ্যার মাধ্যমে যুক্তিপূর্ণ এবং অযৌক্তিক উভয় প্রকার নিয়ম লঙ্ঘনের ক্ষেত্র গুলির একটি বস্তুগত ধারণা লাভ করা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন, কোনও কোনও ক্ষেত্রে নৈতিক কর্তার মধ্যে মতানৈক্য হতেই পারে। একই তথ্য থাকা সত্ত্বেও দুজন ব্যক্তির মধ্যে নৈতিক প্রেক্ষিতে কোনটি করণীয় আর কোনটি পরিহার্য এই বিষয়ে মতবিরোধ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কারণ ব্যক্তিবিশেষে তাদের নৈতিক আদর্শ ভিন্ন হতেই পারে। তিনি এই বিষয়ে যৌথ বিবৃতি প্রদান করেছেন, একাধারে তিনি পক্ষপাতরাহিত্যের ধারণার একটি বস্তুগত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি আবার ক্ষেত্র বিশেষে, নৈতিক দ্বন্দ্ব বা মত বিভেদেরও একটি জায়গা উন্মুক্ত রাখতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, নৈতিক অনুশাসন পালনের ক্ষেত্রে পক্ষপাতরহিত অবস্থান আবশ্যক হলেও, নৈতিক আদর্শের ক্ষেত্রে এই নিরপেক্ষতা বাধ্যতামূলক নয়।

গার্ট-এর নৈতিক ভাবনায় পক্ষপাতরাহিত্যের যে বিশেষ চিত্র ফুটে উঠেছে, সেটির সঙ্গে অনেকাংশে নারীবাদী অভিমতের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। গার্ট ব্যক্তিবিশেষে ভিন্নপ্রকার নৈতিক মননের উল্লেখ করেছেন। নৈতিকতার পরিসরে তিনি নৈতিক অনুশাসনগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন ঠিকই, তথাপি এই নিয়মগুলির অলঙ্ঘনীয়তা গার্ট কখনোই দাবি করেননি। কিন্তু কোনও কোনও নারীবাদী এই মর্মে তাঁর বক্তব্যের বিরুদ্ধে আপত্তি প্রকাশ করে দাবি করতেই পারেন, অধিকাংশ মূলস্রোতের তাত্ত্বিকের ন্যায় গার্ট-ও সর্বজনীনতা এবং বৌদ্ধিকতাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। গার্ট একটি নৈতিক লৌকিক তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত সকল বৌদ্ধিক কর্তার দ্বারা মান্যতাপ্রাপ্ত নৈতিক নিয়মের লঙ্ঘনকেই কেবলমাত্র অনুমোদনযোগ্য বলেছেন। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, গার্ট কট্টর নীতিবাদী তত্ত্বের নৈর্ব্যক্তিক, প্রেক্ষিত-অনপেক্ষ, পক্ষপাতরাহিত্যের ধারণাটি বিশ্লেষণ করেছেন - এবং প্রেক্ষিতের গুরুত্বকে স্বীকার করে তিনি পক্ষপাতরাহিত্যের আদর্শের একটি ভিন্ন রূপ উন্মোচনে প্রয়াসী হয়েছেন।

উপসংহার

নীতিদর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য মানব জীবনের লক্ষ্য অর্জনের উপায় সন্ধান। একটি পরিপূর্ণ এবং শুভ জীবন গড়ে তোলার জন্য সুখবর্ধক কর্ম আবশ্যক। সামাজিক সংহতি, ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা এবং ব্যক্তিগত তথা সাম্প্রদায়িক কল্যাণের স্বার্থে জগতে শুভর বৃদ্ধি এবং অশুভর নাশ হওয়া কাম্য। কিন্তু বর্তমানকালে আমরা অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি যখন সামাজিক মূল্যবোধ তলিয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষমতার রাজনীতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিকট অতীতে যে ভয়াবহ অতিমারীর সম্মুখীন হল গোটা বিশ্ব, সেই আতঙ্ক সমস্ত মানব চেতনাকে ক্রমশ প্রগাঢ় অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিয়েছে। এছাড়াও বিশ্বব্যাপী অর্থ, ক্ষমতা, ধর্ম নিয়ে হানাহানি, বিদ্বেষ, যুদ্ধ এবং অশান্ত পরিবেশের কারণে মানব জাতির অস্তিত্ব বিষয়ে এক প্রবল আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এমন একটা সমাজ আমাদের সকলেরই কাম্য যেখানে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের পরিবর্তে ক্ষমতার বিস্তার ঘটবে, নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থে অপর ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বঞ্চনা, পীড়ন তথা অবমূল্যায়ন ঘটবে না। যেখানে সকল ভিন্নতা সত্ত্বেও মানুষের নিজস্ব স্বর ও মূল্যবোধ মর্যাদা পাবে, সেইরূপ সমাজ আমাদের প্রত্যেকের কাঙ্ক্ষিত। বাস্তব জীবনে নৈতিক আচরণ বা সিদ্ধান্ত কেবল বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা দ্বারা পরিচালিত হবে, না কি বুদ্ধি ও আবেগ আমাদের যাপনের মান উন্নত করবে তা নিয়ে দার্শনিক মহলে বাদানুবাদ অব্যাহত রয়েছে। চিন্তায় যুক্তিনিষ্ঠ থেকেও ব্যক্তি হৃদয়াবেগ, সহমর্মিতা, অপরের প্রতি সংবেদনশীল হওয়ার প্রচেষ্টা করে এবং সমাজে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পারস্পরিক ভিন্নতাকে মর্যাদা দিয়ে সহযোগিতার মাধ্যমে সার্বিক মঙ্গলের লক্ষ্যে অগ্রসর হতে চায়।

ধ্রুপদী পাশ্চাত্য নীতিদর্শন বিশেষত বুদ্ধিবাদী ভাবনায়, বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার কর্তৃত্ব স্বীকার করা হয়েছে। ফলত নৈতিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আবেগ, অভিজ্ঞতা, প্রসঙ্গ, সহমর্মিতা প্রভৃতি বিষয়গুলি

অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। মূলধারার নৈতিক ভাবনা এবং প্রেক্ষিত-বর্জিত পুংকেন্দ্রিক জ্ঞান ধারাবাহিক ভাবে গুরুত্ব আরোপ করে এসেছে বিষয়তা, পক্ষপাতরাহিত্য, যৌক্তিকতা, বিমূর্তায়ন প্রভৃতির উপর। বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভে বিশেষত নৈতিক কর্তার পক্ষপাতরহিত (Impartial) অবস্থানটিকে গুরুত্ব সহকারে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বুদ্ধিবাদী দর্শনে দাবি করা হয় পক্ষপাতরাহিত্য একটি আকারগত ধারণা যা জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিষয়ের আবশ্যিক ধর্ম স্বরূপ। একই সঙ্গে একটি মানুষের নৈতিক বিচার, সিদ্ধান্ত তথা নৈতিক কর্মের এক অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য। এক কথায় পক্ষপাতরাহিত্যের অর্থ যেকোন প্রকার পক্ষপাত মুক্ত থাকা। প্রকৃত জ্ঞান লাভের জন্য জ্ঞাতার প্রয়োজন নিরপেক্ষ অবস্থান অবলম্বন করা। সাপেক্ষতাশূন্য এবং সংস্কার মুক্ত মনুষ্যকৃত কর্মগুলিই নৈতিক ভাবে মূল্যবান। আমরা দেখেছি যে, ইমানুয়েল কান্ট এবং জন রলস প্রস্তাবিত নৈতিক ভাবনায় পক্ষপাতরাহিত্যের আদর্শটি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। শর্ত নিরপেক্ষ অনুজ্ঞাকে কান্ট তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠ নৈতিকতার চূড়ান্ত মাপকাঠি রূপে নির্ধারিত করেন। কান্টের দৃষ্টিতে নৈতিকতা হল- বিশুদ্ধ প্রয়োগিক বৌদ্ধিকতার আদেশ। নৈতিক জ্ঞান, বিচার তথা নৈতিক সিদ্ধান্ত বিষয়ক ভাবনাকে সামগ্রিক ভাবে পক্ষপাতরহিত রূপে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে কান্ট, নৈতিকতার অবশ্য পূরণীয় শর্ত হিসাবে বিশুদ্ধ বৌদ্ধিকতাকেই বেছে নিয়েছেন। তাঁর মতে অনুরাগ, আবেগ, স্নেহ প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিগুলি মানুষের কাজের অনুষঙ্গ হলেও, সেগুলি যেন কখনো প্রধান পরিচালিকা শক্তিরূপে সক্রিয় না হয়ে ওঠে সেই বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। অন্যথায় সেটি নৈতিক ক্রিয়ারূপে পরিগণিত হবে না।

জন রলস যুক্তিপরায়ণতাকে নৈতিক হওয়ার একমাত্র পন্থারূপে চিহ্নিত করেন। তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক পরিসরে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদানটি রলসীয় পরিভাষায় ‘আদি অবস্থান’ (Original

Position)। এই আদি অবস্থানে থেকে চিন্তন করা একটি দার্শনিক যৌক্তিক পদ্ধতি, যার উদ্দেশ্য নৈতিকতার একটি যথার্থ অর্থ এবং বিশেষরূপ উত্থাপিত করা। আদি অবস্থানের মাধ্যমে রলস ন্যায্যতার ব্যাখ্যাপূর্বক তার প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যত হয়েছেন। ভবিষ্যৎ সমাজকে যথাযথ ভাবে চালনা করার লক্ষ্যে ভিন্ন মানসিকতাসম্পন্ন মানুষ একত্রিত হয়ে যখন কিছু মৌলিক এবং স্থায়ী ন্যায্যতার নীতি স্থির করেন, সেক্ষেত্রে দার্শনিক উক্ত পদ্ধতিকে ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগে, সমাজের বহুল ভিন্নতা সত্ত্বেও কিভাবে নির্দিষ্ট নিরপেক্ষ নীতি নির্ধারণ করা সম্ভব হবে? এই প্রসঙ্গে রলস, অজ্ঞতার আবরণের (Veil of ignorance) উল্লেখ করেন। এই অজ্ঞতার আবরণের দ্বারা সকল প্রকার বিশিষ্টতা, প্রত্যেক মানুষের প্রেক্ষিতের নির্দিষ্টতা, পারিপার্শ্বিক অবস্থানের ভিন্নতাকে অদৃশ্য করা হয়। রলসের এই অজ্ঞতার আবরণের চিত্রায়নের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হল- নৈতিক নীতিগুলি যেন পক্ষপাতরহিত এবং স্বাধীনভাবে গ্রহণযোগ্য হয় সেটি নিশ্চিত করা।

নারীবাদী দর্শনে লিঙ্গপ্রেক্ষিতের সঙ্গে এক দিকে বৌদ্ধিকতার এবং অন্য দিকে বিষয়তার সম্পর্ক নিয়ে বহু বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জ্ঞানতত্ত্বের অনুষঙ্গে এই আলোচনা বিশেষ তাৎপর্যমূলক হলেও, নৈতিকতার পরিসরে দেশ, কাল, পরিস্থিতি, বিষয়িতা অনপেক্ষ এক সর্বজনীন এবং আবশ্যিক নীতি বা বিচার ধারা গ্রহণের পক্ষে অধিকাংশ ধ্রুপদী বুদ্ধিবাদী দার্শনিক মত দিয়েছেন। মানুষ নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যে নীতি দ্বারা পরিচালিত হবেন তা কেবল বিশুদ্ধ বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা দ্বারাই প্রাপ্ত বলে কান্ট এবং রলস দাবি করেছেন। সেই নীতি শর্তহীন অনুজ্ঞাই হোক বা রলসীয় আদি অবস্থানে থেকে ন্যায্যতার নীতি গঠনই হোক।

ধ্রুপদী দার্শনিক পরম্পরার সমালোচনাপূর্বক নারীবাদী, নারী ও পুরুষের লিঙ্গ-পরিচয় নির্মাণের ব্যাখ্যা করে দেখাতে চেয়েছেন নারী তার আদর্শ গুণসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও, কিভাবে তার

নৈতিকতা পুরুষালি বিচারবোধ, বৌদ্ধিকতা ও নিরপেক্ষতার পৃষ্ঠপোষক না হওয়ায় মূলস্রোতের দর্শনে অবমূল্যায়িত হয়েছে। এইপ্রকার লিঙ্গ-রাজনীতির সঙ্গে নৈতিকতা বা নৈতিক আদর্শকে যুক্ত করে বিবেচনা করলে স্বার্থ, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব প্রভৃতি বিষয়গুলি নৈতিকতার পরিধিতে প্রবেশ করে। তাই নারীবাদী নীতিদর্শনে পক্ষপাতরহিত, সার্বিক, বিষয়গত, নৈতিক আদর্শের পরিবর্তে আপেক্ষিক নৈতিকতার প্রাসঙ্গিকতাকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। আপেক্ষিক বা অবস্থান-সাপেক্ষ নৈতিকতার কথা কোনও কোনও ধ্রুপদী দার্শনিক উল্লেখ করলেও, তাঁরা লিঙ্গসাপেক্ষে নৈতিক আদর্শ বা নীতি গড়ে তোলার পক্ষপাতী নন। এই গবেষণায় পূর্বপক্ষরূপে মূলস্রোতের বুদ্ধিবাদী মতকেই বিশেষরূপে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে নানা বিকল্প নৈতিক অবস্থানের প্রস্তাব এসেছে যাঁরা মূলত ক্ষমতার মেরুকরণ প্রতিহত করার বিষয়ে চিন্তিত। নারীবাদী দার্শনিক এই বিকল্প নৈতিকতার অন্যতম পথপ্রদর্শক। 'Top-down' বা 'Bottom-up' উভয় ক্ষেত্রেই কোন একটি পক্ষের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব, অপরের অধিকার তথা কর্তব্য নির্ধারণ করে। তাই নারীবাদী নীতিবীক্ষার পরতে পরতে 'power-with-power'-এর অনুমোদন পাওয়া যায়, যেখানে ভিন্নতা সত্ত্বেও বৈষম্য বা উচ্চ-নীচ স্তরায়নের অস্তিত্ব নেই। নারীবাদী দার্শনিক, ব্যক্তির অবস্থান ও সাপেক্ষতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন বলে তাঁরা একপ্রকার বিষয়ীতাকে অনুমোদন করেন, একথা ভাবা সঙ্গত নয়। কারণ তাঁরা স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন বৈধ উপায়ে যে সাপেক্ষতা বা প্রতিপত্তি লাভ হয়, সেই অর্থে কোন একটি বিশেষ অবস্থান-সাপেক্ষে নৈতিকতার প্রস্তাবনা হলে তা দোষের নয়। মুলস্রোতের নীতিতাত্ত্বিক দাবি করেন যে, নীতিদর্শন এবং দর্শনের অন্যান্য শাখা যথা- জ্ঞানতত্ত্ব, সত্তাতত্ত্ব প্রভৃতিগুলি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক এবং অন্যান্য সমস্ত প্রভাবমুক্ত। কিন্তু নারীবাদী এই দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে দেখিয়েছেন, প্রত্যেকের রাজনৈতিক অবস্থান তথা পক্ষপাত উপস্থিত। অতএব পক্ষপাতরহিত কোনও শাস্ত্র হওয়া অসম্ভব। মূলস্রোতের দার্শনিক প্রস্তাবিত বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার ধারণাটির মধ্যে যে বাস্তব ফাঁকি বা অন্যায় লুকিয়ে থাকে, সেটিকে নারীবাদী

আমাদের কাছে বোধগম্য করে তুলেছেন। তাঁরা ব্যাখ্যা করেছেন, বিশুদ্ধ বুদ্ধির দোহাই দিয়ে যে সকল বিধি বা নৈতিক নিয়মকে সর্বজনীন ও অপরিহার্যরূপে মূলস্রোতের নীতিবিদ্ আমাদের উপর বোঝাস্বরূপ চাপিয়ে দেন, তা বাস্তবে আদর্শ পুরুষ বা পুরুষালি ধর্মের প্রতি এক পক্ষপাতকেই নির্দেশ করে।

পক্ষপাতশূন্যতার ধারণাটি প্রায়শই নৈতিক, আইনগত এবং রাজনৈতিক বাদানুবাদের বিষয় হয়ে থাকে। ফলমুখী নৈতিকতা, কর্তব্যমুখী নৈতিকতা এবং অন্যান্য নীতিতত্ত্বে এই ধারণা বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে। আইনের পটভূমিতে ন্যায়-অন্যায় বিচার করার জন্য পক্ষপাতরাহিত্য অতি প্রয়োজনীয় আদর্শ হিসেবে গৃহীত হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক তত্ত্বে এই ধারণার সাহায্য নিয়ে ন্যায্যতা এবং সাম্যের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতার বিষয়টি ব্যাখ্যাত হয়। আবার ব্যক্তিগত পরিসরে এই অনপেক্ষতা মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর এবং অনৈতিক আচরণ করা থেকে বিরত রাখে। রাজনৈতিক পরিসরে অনপেক্ষতা সমাজের কাঠামো এবং তার প্রাতিষ্ঠানিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে এমনভাবে বিন্যস্ত করতে চায় যাতে, নৈতিক অর্থে অপ্রাসঙ্গিক কারণগুলি সমাজ এবং প্রতিষ্ঠানকে তাদের কার্যকারিতা থেকে বিভ্রান্ত না করে। এক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার অর্থ হল, কোন একটি গোষ্ঠীকে অপর কোন গোষ্ঠীর সাপেক্ষে অধিক সুবিধা প্রদান না করা এবং সকল মানুষের জন্য সব ধরনের লাভজনক পরিস্থিতি তথা সুযোগ-সুবিধা অর্জনের পথ উন্মুক্ত রাখা।

নৈতিক এবং রাজনৈতিক তত্ত্বে দীর্ঘকাল ধরে নিরপেক্ষতাবাদী এবং সাপেক্ষতাবাদীদের মধ্যে মতান্তর দেখা গেছে। যেসকল দার্শনিক নিরপেক্ষতার সপক্ষে, তাঁরা নিয়ম-নীতির প্রসঙ্গে নিরপেক্ষতার বিশেষ মূল্য স্বীকার করেন। অপরদিকে সাপেক্ষতাবাদীর কাছে নিরালম্ব নিয়ম-নীতির তুলনায়, ব্যক্তির নিবিড় সম্পর্ক এবং ব্যক্তি জীবনের প্রকল্পগুলি অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

নিরপেক্ষতাবাদী নিরপেক্ষ অবস্থানে থেকে সকলের প্রতি সমান আচরণ এবং ন্যায্য সাহচর্যের দাবি করে থাকেন। কিন্তু সাপেক্ষতাবাদীর কাছে এরূপ অবস্থান অবাস্তব এবং অনাবশ্যক। মানুষের জন্ম, শৈশব তথা যাপন বিশেষ বিশেষ প্রবাহে বাহিত হয়। প্রত্যেক মানুষের জীবনের পরিস্থিতি যেমন ভিন্ন, প্রত্যেকের চাহিদা, প্রয়োজন এবং লক্ষ্যও বিবিধ। আবার সকলের ক্ষেত্রে পীড়ন, অত্যাচার কিংবা অবমাননার মাত্রাও এক নয়। সমাজে একদল মানুষ বা গোষ্ঠীর কর্তৃত্বের হেতু অপর একদল নিপীড়িত, অত্যাচারিত এবং অবমূল্যায়িত। এহেন পরিস্থিতিতে সকলের প্রতি সমান আচরণ করা সম্ভব নয় এবং কাম্যও নয়। সকল ব্যক্তি সমাজে সমআকারে ক্ষমতাশালী নন। ব্যক্তিকে এমন অনেক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় যেখানে নৈতিক অনুশাসন রক্ষার তাগিদেই তাঁর নিরপেক্ষ অবস্থান বর্জন করা প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। প্রত্যেক নৈতিক কর্তা নিজের জীবনে উন্নতি সাধন, আনন্দ এবং পরিপূর্ণতা লাভের জন্য তাঁর কাছের মানুষদের প্রতি বিশেষ দায়বদ্ধতা অনুভব করে থাকেন। যাদের সঙ্গে তাঁর ভালো থাকা যুক্ত হয়ে আছে এবং যাদের সঙ্গে তাঁর জীবনের প্রকল্পগুলির সাফল্য জড়িয়ে আছে, তাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হতে ব্যক্তি অধিক আগ্রহী হয়। আত্মীয়, পরিজন, বন্ধু-বান্ধবের প্রতি মানুষের আন্তরিকতা রচিত হয় নিবিড় সখ্যতা এবং সম্পর্কের মাধ্যমে। এই সম্পর্কের তাগিদেই ঘনিষ্ঠ মানুষদের প্রতি ব্যক্তি অনায়াসে নৈতিক কর্তব্য পালন করতে পারে।

নৈতিকতার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পর্কের বুননের যেমন বিশেষ ভূমিকা রয়েছে, তেমনি সামাজিক পরিসরে অপরাপর মানুষের প্রতি অন্যায় না করা, রাষ্ট্রপ্রদত্ত সকল সুবিধার ন্যায্য বন্টন করা, অপরের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ থেকে নিজের অধিকার দাবি করার প্রসঙ্গগুলিরও সমমাত্রায় গুরুত্ব রয়েছে। দুটি কোটিই মূল্যবান, তাই সার্বিক মঙ্গল সাধনের ক্ষেত্রে কোন একটি পক্ষ অবলম্বন করা যুক্তিসঙ্গত নয়। ধ্রুপদী তত্ত্বভূমিতে পক্ষপাতরাহিত্যের ধারণাটি পরিপূর্ণ বা

যথাযথরূপ পায়নি। একটি যথার্থ সমৃদ্ধ নৈতিক পরিকাঠামো গঠন করতে হলে নিরপেক্ষ অবস্থান বিষয়ে গভীর বিচারমূলক উপলব্ধি আবশ্যক।

প্রেক্ষিতকে সম্পূর্ণ বর্জন বা উপেক্ষা করে নিরপেক্ষতার আদর্শনিষ্ঠ নীতিতত্ত্ব আপাতদৃষ্টিতে পরিমার্জিত হলেও বাস্তবে এটি ত্রুটিপূর্ণ। নারীবাদী প্রমাণ করেন, মূলস্রোতের নীতিশাস্ত্রের পক্ষপাতরাহিত্যের আদর্শটি বাস্তবে সামাজিক উচ্চ-নীচ স্তরায়ণ এবং অবদমনের প্রক্রিয়াকে প্রশ্রয় দেয়। অধিকাংশ ধ্রুপদী নীতিদার্শনিকরা সাপেক্ষতার নৈতিক তাৎপর্যকে প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ তাঁদের মতে, নৈতিকতাকে মৌলিক এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরপেক্ষ হতে হবে। মূলস্রোতের নীতিদর্শনে যে নিরালম্ব দৃষ্টিভঙ্গীর (View from nowhere) উল্লেখ করা হয়, Nagel তার সমালোচনা করেন। যথার্থ নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা এবং সাপেক্ষতা উভয়ের প্রয়োজন স্বীকার করেন তিনি। একইভাবে কিছু কিছু নারীবাদী মনে করেন, নৈতিকতার প্রেক্ষিতে এই দুই উপাদানই জরুরী এবং এদের একটির দ্বারা অপরটিকে প্রতিস্থাপন (replace) করা সম্ভব নয়। ব্যক্তিবিশেষে প্রেক্ষিতের ভিন্নতা বর্তমান, ফলে ন্যায়তত্ত্বে প্রেক্ষিত-সচেতনতাকে স্থান দেওয়া প্রয়োজনীয়।[১]

কোনও কোনও নারীবাদী মনে করেন, নৈতিকতার পরিসরে পক্ষপাতরাহিত্যের আদর্শটির প্রয়োগ সীমিত। এরূপ মত অনুসারে, নৈর্ব্যক্তিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এইপ্রকার নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি প্রযোজ্য হতে পারে। এই অর্থে, সাংগঠনিক নিয়ম-নীতির ক্ষেত্রে পক্ষপাতরাহিত্যের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে নৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ আচরণগুলিকে ন্যায্যতা প্রদানে অক্ষম এই পক্ষপাতরাহিত্য। নিকট বন্ধুত্ব বা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের চাহিদাগুলি পূরণ করার ক্ষেত্রে

[১] Jollimore, Troy, “Impartiality”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, https://plato.stanford.edu/entries/impartiality/ (online source), cited on 05/01/2022.

নিরপেক্ষ উদ্দেশ্যের পরিবর্তে দরদী দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করাই অধিক কাম্য। ব্যক্তির নৈতিক যথার্থতার জন্য অনুরাগ, সংবেদ, আনুগত্য, দরদ, অঙ্গীকারবদ্ধতা প্রভৃতি থাকা আবশ্যক এবং পর্যাপ্ত। আবার কিছু কিছু নারীবাদী মনে করেন, দরদ এবং মরমী সম্পর্ক কেবলমাত্র ব্যক্তিগত জীবনে প্রয়োজনীয় এমনটা নয়, নিরপেক্ষ নৈতিকতাতেও এটির গুরুত্ব বর্তমান। তাঁদের বক্তব্য হল, চিরায়ত নীতিবিদগণ একটি ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন যে নিরপেক্ষ বৌদ্ধিকতার ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্ক, দরদ, আনুগত্য প্রভৃতি অপ্রয়োজনীয়। পক্ষপাতরাহিত্যের আদর্শের দ্বারা কোন একটি বিশেষ বর্গের বা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সাধারণীকরণ করে, ব্যক্তিকে বোঝার কথা বলা হয়। নারীবাদীরা এক্ষেত্রে আপত্তি জানিয়ে বলেন, এমন পন্থা অবলম্বন করলে প্রতিটি প্রসঙ্গের নির্দিষ্টতা বা পুঙ্খানুপুঙ্খতা এবং অনন্যতাকে অগ্রাহ্য করা হয়। কারণ নৈতিকবোধের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির বিশেষতাকে উপলব্ধি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং বলা যেতে পারে, নিরপেক্ষ বৌদ্ধিকতার অপর্যাপ্ততা রয়েছে, কারণ এক্ষেত্রে মানুষের বিভিন্নতা স্থান পায় না।

নিরপেক্ষ চিন্তনের ক্ষেত্রে সাধারণীকরণ যোগ্যতার উপর ভরসা করা হয়ে থাকে। কিন্তু মেরিলিন ফ্রিডম্যান মনে করেন, এইপ্রকার সাধারণীকরণের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে অনপেক্ষতার মোড়কে আবৃত পক্ষপাতকে আড়াল করার প্রচেষ্টা করা হয়। নিরপেক্ষ বৌদ্ধিকতা উক্তপ্রকার পক্ষপাতকে নির্মূল করতে অক্ষম। প্রতিটি সামাজিক গোষ্ঠী কিছু ঐতিহ্য বহন করে চলে, যার মধ্যে বিশেষ বিশেষ পক্ষপাত গ্রথিত থাকে। সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নৈতিক কর্তার নিকট স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় না। ফ্রিডম্যান-এর মতে, একজন যোগ্য এবং যথার্থ নৈতিক কর্তা চিন্তাশীল ও প্রতিফলনসমৃদ্ধ কৌশল অবলম্বন করে নিরপেক্ষ নৈতিক চিন্তনের মোড়কে আবৃত গোষ্ঠীভিত্তিক পক্ষপাতকে চিহ্নিত করতে পারেন এবং তার সংশোধন করতে সমর্থ হন। পক্ষপাতরাহিত্যের প্রতি অত্যধিক অনুরাগবশত দার্শনিক, নৈতিকবোধের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অপর সামর্থ্যগুলির প্রতি উদাসীন থেকেছেন। যদি বাস্তবে মানব চাহিদা এবং পরিস্থিতিকে উপলব্ধি

করতে হয় তাহলে কেবলমাত্র পক্ষপাতরাহিত্যকে নয়, যত্নশীল মনোভাব বা মরমী ভাবনাকেও নৈতিক প্রেক্ষাপটে মান্যতা দিতে হবে।

ইয়ং-এর মতে মূলস্রোত প্রস্তাবিত পক্ষপাতরাহিত্যের ধারণাটির বাস্তব প্রয়োগ অসম্ভব এবং অনাবশ্যক। তাঁর মতে, সমাজের কেন্দ্রে অবস্থিত ক্ষমতাসম্পন্ন শ্রেণীর মানুষ এরূপ সার্বিক, নিরপেক্ষতার দাবী করে নিজেদের একপাক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গীকে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী বলে প্রতিষ্ঠা করে এসেছে। ইয়ং মনে করেন, ধ্রুপদী ন্যায়নীতি তত্ত্বগুলিতে প্রেক্ষিতবিষয়ক সচেতনতাকে অবজ্ঞা করা হয়। অথচ এই প্রেক্ষিতবিষয়ে সচেতনতা, যথার্থ নৈতিক তত্ত্বে থাকা অত্যন্ত জরুরী। তাঁর মতে, ধ্রুপদী নীতিতত্ত্বে নিরপেক্ষতার আদর্শের ভিত্তিতে যেরূপ আকারগত প্রাকল্পিক তত্ত্ব গঠন করা হয়েছে, সেরূপ কাল্পনিক চুক্তি না করে, এমন একটি নৈতিক কাঠামো প্রস্তুত করতে হবে, যে পরিকাঠামোয় বাস্তব জগতের প্রত্যেকে অংশগ্রহণ করতে পারবে। ইয়ং যে নৈতিক পরিকাঠামোর উল্লেখ করেছেন তার পরতে পরতে প্রতিটি স্বতন্ত্র স্বরের ভিন্নতাকে মর্যাদা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। মূলস্রোতের ভাবনা কাঠামোয় বিবিধ, বিপন্ন, প্রান্তিক মানুষের যাপন অভিজ্ঞতার বহুত্ব ও বিশিষ্টতাকে উপেক্ষা করে একপ্রকার সাধারণ, বিমূর্ত চিন্তাভ্যাসের প্রবণতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

নীতিবিদ্যায় নারী তথা প্রান্তিক মানুষের মনন শক্তির অবমাননার অবসান ঘটানোর স্বার্থে নারীবাদী যে যে বিকল্প নীতিশাস্ত্রের উল্লেখ করেন তাদের মধ্যে অন্যতম, দরদী নীতিবিদ্যা। দরদী নীতিবীক্ষার সূচনা হয় নির্দিষ্ট বা বিশেষ অপরের (Particular Others) নৈতিক দাবি থেকে। এক্ষেত্রে অপরের প্রতি যত্নশীল হওয়া, অপরের সমস্যা-প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিয়ে শোনা, বোঝার চেষ্টা করা এবং অপরের প্রতি দায়িত্বপূর্ণ আচরণ করা আবশ্যক। হেল্ড মনে করেন, তথাকথিত পক্ষপাতরহিত নৈতিক তত্ত্ব যথা- কান্ট, রলসের নীতিতত্ত্বগুলি অপর্যাপ্ত। কারণ এইসকল তত্ত্বে,

বিমূর্ততা এবং নিরপেক্ষতাকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে, ব্যক্তির জীবনের মূর্ত পরিস্থিতিকে অগ্রাহ্য করা হয়। উক্তপ্রকার তত্ত্বগুলি, প্রত্যেক মানুষের নির্দিষ্ট পরিস্থিতি-সাপেক্ষ সমস্যাগুলির প্রতি অবিদিত।

নডিংস্-এর মতে, প্রায় প্রত্যেকেই আমরা কোনও না কোনভাবে, কখনও না কখনও অপরের দরদী আচরণের দ্বারা উপকৃত হয়ে থাকি। এটি অবশ্য স্বীকার্য যে দরদের একটি মৌলিক এবং অপরিহার্য মূল্য বর্তমান। নিরপেক্ষ তত্ত্ব এবং দরদী নীতিতত্ত্বের মৌলিক পার্থক্যটি হল– দরদী নীতিতত্ত্বের মূল্যের উৎস হল, নির্দিষ্ট ব্যক্তিবিশেষ এবং তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক। অপরদিকে, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবলীর মূল্যের উৎস হল সাধারণ ন্যায্যতার নীতিসমূহ। ধ্রুপদী পক্ষপাতরহিত তত্ত্বগুলিতে মূর্ত সম্পর্ককে অবজ্ঞা করে, বিমূর্ত অনপেক্ষতাকে প্রতিষ্ঠা করার স্বার্থে কর্তব্যনিষ্ঠতাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়ে এসেছে। কিন্তু দরদী নীতিদর্শনের আলোচনায় বারংবার, নৈতিকতার প্রেক্ষিতে সম্পর্ক, সংযুক্তি, সাপেক্ষতা এবং সংবেদনশীলতার গুরুত্বের কথা উঠে এসেছে। মানুষের বৌদ্ধিক নীতি গঠনের ক্ষমতার মতো অপরের সাথে সম্পর্কিত থাকা, সংবেদনশীল হওয়া, অপরের অবস্থা বোঝার সামর্থ্য ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরী। চিরয়াত তত্ত্বভূমিতে বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন, স্বাধীন, স্বতন্ত্র, স্বাস্থ্যবান, পরিণত মানবকে সূত্রস্থলরূপে বিবেচনা করা হয়। নির্ভরতা, পারস্পরিক আদান-প্রদান, সম্পর্কিত থাকা, পরমুখাপেক্ষিতা, শারীরিক **অসামর্থ্যতা** প্রভৃতি ব্যক্তি জীবনের সাধারণ সত্যগুলিকে নৈতিক পরিধি থেকে পরিত্যাগ করা হয়েছে।

বার্নার্ড গার্ট-এর মতানুসারে, পক্ষপাতরাহিত্যের জটিল ও দুরূহ ধারণাটি মূলস্রোতের ভাবনায় নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির এক আবশ্যিক বৈশিষ্ট হলেও, তার ব্যবহারিক যৌক্তিকতা নিয়ে সংশয় করার কারণ অনেক। ধ্রুপদী নীতিতত্ত্বে বিশেষত বুদ্ধীবাদী দার্শনিক ঘরানায় এই ধারণার

সরলীকরণ করা হয়েছে। তাঁর মতে একজন নৈতিক কর্তা কার প্রতি নিরপেক্ষ আচরণ করছে এবং কোন্ পরিস্থিতি বা প্রেক্ষিতে নিরপেক্ষ অবস্থান অবলম্বন করছে- সেটি বিবেচনা করা জরুরী। তিনি দাবি করেন পক্ষপাতশূন্যতা একটি আকার সর্বস্ব, শূন্যগর্ভ শব্দ বা পরিভাষা নয়। এই ধারণার মধ্যে যে তিনটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সেগুলি হল ক্রমে- ১) কর্তা অর্থাৎ যিনি নিরপেক্ষ নির্বাচন করেন, ২) অপর- অর্থাৎ যার প্রতি নিরপেক্ষ আচরণ করা হয়েছে এবং ৩) বিষয় বা ক্ষেত্র যার নিরপেক্ষ আচরণ করা হয়েছে। গার্ট একাধারে পক্ষপাতরাহিত্যের ধারণার একটি বস্তুগত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। একইসঙ্গে তিনি আবার ক্ষেত্র বিশেষে, নৈতিক দ্বন্দ্ব বা মত বিভেদেরও একটি জায়গা উন্মুক্ত রাখতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, নৈতিক অনুশাসন পালনের ক্ষেত্রে পক্ষপাতরহিত অবস্থান আবশ্যক হলেও, নৈতিক আদর্শের ক্ষেত্রে এই নিরপেক্ষতা বাধ্যতামূলক নয়। গার্ট-এর নৈতিক ভাবনায় পক্ষপাতরাহিত্যের যে বিশেষ চিত্র ফুটে উঠেছে, সেটির সঙ্গে অনেকাংশে নারীবাদী অভিমতের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। গার্ট ব্যক্তিবিশেষে ভিন্নপ্রকার নৈতিক মননের উল্লেখ করেছেন। নৈতিকতার পরিসরে তিনি নৈতিক অনুশাসনগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন ঠিকই, তথাপি এই নিয়মগুলির অলঙ্ঘনীয়তা গার্ট কখনোই দাবি করেননি।

বার্নাড উইলিয়ামস্ মনে করেন, নৈতিক চিন্তনের প্রধান লক্ষ্য মানুষের দ্বারা এমন এক জগৎ নির্মাণ করা যেখানে সকলের সামাজিক, সংস্কৃতি এবং ব্যক্তিগত জীবনের মূল্য গুলি বহাল থাকে। মানুষের জন্য নৈতিকতা প্রয়োজন। কিন্তু সেই নৈতিকতা মানুষকে অতিক্রম করে নয়।[২] নৈতিকতা এমনই হবে যেটি তাত্ত্বিক পরিসরকে অতিক্রম করে, বাস্তব জগৎ ও মানব জীবনের প্রায়োগিক ক্ষেত্রে অনুমোদিত হবে। অধিকাংশ চিরায়ত নীতিদর্শন অনুসারে নৈতিক বোধ, দায়িত্ব এবং ন্যায়-অন্যায়ের ধারণাগুলি নীতিতত্ত্ব থেকেই নিঃসৃত। কিন্তু উইলিয়ামস্ের মতে, মানব

---

[২] Williams, Bernard, *Ethics and the Limits of Philosophy,* Cambridge university press, 1985.

জীবনের জটিলতা, মূল্যবোধের বহুমুখীতা, যাপনের বিভিন্নতাকে কোনভাবেই নির্দিষ্ট একটি কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করে সামগ্রিক সামঞ্জস্যপূর্ণ তত্ত্ব গঠন অসম্ভব। নীতিতত্ত্বের প্রকৃত কাজ হল-মানুষের দ্বারা নির্বাচিত বিভিন্ন আবশ্যিক মূল্য বা মূল্যায়নের মাত্রাগুলির স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন নৈতিক বিবেচনাগুলিকে বিশ্লেষণ করা। যেহেতু মানব জীবনে নৈতিকতা বহুমাত্রিক, তাই প্রয়োজনে ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক তত্ত্বগুলিকে কাজে লাগানো যেতে পারে।

পরিশেষে বলা যেতে পারে, নীতিতত্ত্বে বিমূর্ততার উপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপের অর্থ হল, মানব জীবনের বৈচিত্র এবং অভিজ্ঞতাগুলির বিভিন্নতার প্রাসঙ্গিকতাকে অস্বীকার করা। নৈতিক পরিসরে লিঙ্গ-সাম্য সুরক্ষিত রাখার তাগিদে পক্ষপাতরহিত অবস্থানের পরিবর্তে পরিস্থিতি সচেতন ন্যায়নীতির ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা হতে পারে। শুধুমাত্র প্রজ্ঞা বা যুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না। পারস্পরিক সম্পর্ক, সখ্যতা এবং সহমর্মিতার দ্বারা মানুষ যথার্থ নৈতিক নীতি স্থাপনে সফল হবে। আমাদের জীবনের লক্ষ্য যদি হয় একটি যূথবদ্ধ সমৃদ্ধ যাপন, তাহলে একটি যথাযথ মানবধর্মী ন্যায়-পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে, এবং তার ব্যবহারিক বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পর্কের বুনন, নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতের বিশেষতা, ভিন্ন নৈতিক বোধ, উপলব্ধি এবং সদৃশ বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিতে হবে। নিরপেক্ষতার আদর্শ আমাদের নৈতিক জীবন যাপনের অন্তরায় না হয়ে ওঠে তার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। শুধুমাত্র তত্ত্ব গঠনের খাতিরে মানব জীবনের জটিলতা, বহুমুখীতা অদৃশ্য করার প্রয়াস বর্জন করতে হবে। সমাজে বৈষম্যহীন, বাস্তব উপযোগী ন্যায় পরিকাঠামো প্রতিষ্ঠার স্বার্থে প্রেক্ষিত-সচেতনতা, ভেদ বা পৃথকতাকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রন্থপঞ্জি

গুপ্ত, দীক্ষিত, *নীতিশাস্ত্র,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা ২০০৭ ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ,*শান্তিনিকেতন (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড),* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪০৯ (বঙ্গাব্দ)।

বাগচী, নন্দিতা ও চ্যাটার্জি সিনহা, অতসী, *দার্শনিক তত্ত্বায়নে নারীবাদ : ভিন্ন মননে বিচিত্র আলাপ,* এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০১৭।

ভাসীন, কমলা, *পিতৃতন্ত্র কাকে বলে?* স্ত্রী, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ১।

মৈত্র, শেফালী, *নৈতিকতা ও নারীবাদ,* নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ২০০৩, পৃ. ১২২।

সরকার, প্রহ্লাদ কুমার (সম্পাদিত), *কান্টের দর্শন,* দর্শন ও সমাজ ট্রাস্ট, হাওড়া, ২০০৪।

Baron, Marcia. "Impartiality and friendship." *Ethics* 101 (4), 1991, pp. 842-43.

Bhasin, Kamla & Khan, Nighat Said. *Feminism and Its Relevance in South Asia,* New Delhi: Women Unlimited, 2007.

Bhasin, Kamla. *Understanding Gender,* New Delhi: Women Unlimited, 2000.

Bhasin, Kamla. *What Is Patriarchy?,* New Delhi : Women Unlimited, 2007.

Blum, Lawrence A. "Gilligan and Kohlberg: Implications for Moral Theory." *Ethics,* vol. 98, no. 3, 1988, pp. 472–91.

Blum, Lawrence. *Moral Perception and Particularity*, Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

Blum, Lawrence. "Particularity and Responsiveness." *The Emergence of Morality in Young Children*, ed. J. Kagan and S. Lamb, Chicago, IL: University of Chicago Press, 1987, pp. 321-35.

Bramer, Marilea. "The Importance of Personal Relationships in Kantian Moral Theory: A Reply to Care Ethics." *Hypatia* 25.1, 2010.

Calhoun, C. "Justice, Care, Gender Bias." *Journal of Philosophy*, 85: 9, 1988.

Chatterjee Sinha, Atashee, *The Many Faces of Reason and Violence*, Papyrus, Kolkata, 2005.

Clouser, K. Danner, and Bernard Gert. "Common morality." *Handbook of Bioethics: Taking Stock of the Field from a Philosophical Perspective*, 2004, pp. 121-141.

Engels, Frederick. *The Origin of the Family, Private Property and the State*, New York: International Publisher, 1972.

Fricker, Miranda, and Hornsby, Jennifer, eds. *The Cambridge Companion to Feminism in Philosophy*, Cambridge University Press, Cambridge, 2000.

Friedman, Marilyn. “Feminism in Ethics: Conceptions of Autonomy.” *The Cambridge Companion to Feminism in Philosophy*, Miranda Fricker and Jennifer Hornsby (eds.), Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

Friedman, Marilyn. “Impartiality.” *A Companion to Feminist Philosophy*, Alison M. Jaggar and Iris Marion Young (eds.), Massachusetts: Blackwell Publishers Inc., 1998.

Friedman, Marilyn. “The Impracticality of Impartiality.” *The Journal of Philosophy*, vol. 86, no. 11, 1989, pp. 645–56.

Friedman, Marilyn. “The Practice of Partiality.” *Ethics*, vol. 101, no. 4, 1991, pp. 818–35.

Gardiner, Judith Kegan, ed. *Masculinity Studies and Feminist Theory*, Columbia University Press, 2002.

Garrett, Jacob. "Recovering an Ideal: Impartiality as Democratic Listening." *Western Political Science Association*, 2014.

Gert, Bernard, and Danner Clouser. "Morality and its applications." *Building bioethics: Conversations with Clouser and Friends on Medical Ethics*, Dordrecht: Springer Netherlands, 1999, pp. 147-182.

Gert, Bernard. "Loyalty and Morality." *Nomos* 54, 2013, pp. 3-21.

Gert, Bernard. "Moral Arrogance and Moral Theories." *Philosophical Issues* 15, 2005, pp. 368-385.

Gert, Bernard. "Moral Impartiality." *Midwest Studies in Philosophy* 20, 1995, pp. 102-128.

Gert, Bernard. "Moral Theory and Applied Ethics." *The Monist* 67.4, 2014, pp. 532-548.

Gert, Bernard. "Morally Relevant Features." *Metaphilosophy* 30.1-2, 1999, pp. 13-24.

Gert, Bernard. "Obey the Law as a Moral Rule." *JRE* 11, 2003.

Gert, Bernard. "Rationality, Human Nature, and Lists." *Ethics* 100.2, 1990, pp. 279-300.

Gert, Bernard. "Reasons and Rational Requirements." *JRE* 13, 2005.

Gert, Bernard. "The Law of Nature as The Moral Law." *Hobbes studies* 1.1, 1988, pp. 26-44.

Gert, Bernard. *Morality: A New Justification of The Moral Rules,* Oxford University Press, 1988.

Gert, Bernard. *Common Morality: Deciding What to Do.* Oxford University Press, 2004.

Gert, Bernard. *Morality: Its Nature and Justification.* Oxford University Press, USA, 1998.

Gilligan, Carol, *et al.,* (eds). *Mapping the Moral Domain*, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1988.

Gilligan, Carol, *In a Different Voice*, Harvard University Press, Cambridge, 1993.

Gilligan, Carol. "Looking Back to Look Forward: Revisiting In a Different Voice." *Joining the Resistance*, Cambridge, Mass., Polity Press, 2011, pp. 14-43.

Gilligan, Carol. *In a Different Voice*, Harvard University Press, Cambridge, 1993.

Green, Karen. "Reason and Feeling: Resisting the Dichotomy." *Australasian Journal of Philosophy*, 1471-6828, Volume 71, Issue 4, 1993, pp. 385-99.

Held, Virginia. "Rights." *A Companion to Feminist Philosophy*, Alison M.Jaggar and Iris Marion Young (eds.), Oxford : Blackwell Press, 2000, pp. 500-10

Held, Virginia. *The Ethics of Care: Personal, Political, and Global*, Oxford University Press, 2006.

Herman, Barbara. “The Practice of Moral Judgment.” *The Journal of Philosophy*, vol. 82, no. 8, 1985, pp. 414–36.

Hooker, Brad. "When is Impartiality Morally Appropriate?." *Partiality and Impartiality: Morality, Special Relationships, and the Wider World*, Oxford University Press, 2010.

Hume, David. *A Treatise of Human Nature*, (Book III, part 3, Section I), reprinted Oxford University Press, 2nd. Edition, 1739 (1978).

Jaggar, Alison M., and Young, Iris Marion, eds. *A Companion to Feminist Philosophy*, Blackwell Publishers Ltd., Oxford, 2000.

John Stuart Mill, “Utilitarianism.” *Ethics: Classical Western Texts in Feminist and Multicultural Perspectives*, ed. James P. Sterba, Oxford University Press, New York, 2000.

Kant, Immanuel. *Grounding for The Metaphysics of Morals,* 3rd ed. Trans. James W. Ellington. Indianapolis: Hackett Publishing, 1993.

Kant, Immanuel*.* *Groundwork of the Metaphysic of Morals*, Trans. By H.J. Paton, as *The Moral Law*, Hutchinson and Co (Publishers) Ltd., London, 1976.

Kant, Immanuel. *Observations on the Feeling of the Beautiful and Sublime.* University of California Press, 2003.

Kiss, Elizabeth. “Justice.” *A Companion to Feminist Philosophy*, eds. Alison M. Jaggar and Iris Marion Young, Blackwell Publishers Ltd., Oxford, 2000, pp. 487-99.

Koehn, Daryl, *Rethinking Feminist Ethics: Care, Trust and Empathy*, Routledge, London, 1998.

Lloyd, Genevieve. *The Man of Reason*, Vol. 10, No. 1, January 1979.

Mahadevan, Kanchana. “The Ethics of Care: Carol Gilligan.” *Between Femininity and Feminism Colonial and Postcolonial Perspective on Care*, New Delhi: ICPR & D. K. Print world, 2014, pp. 105-41.

Meyers, D. *Subjection and Subjectivity: Psychoanalytic Feminism and Moral Philosophy*, New York: Routledge, 1994.

Mill, John Stuart. *Utilitarianism*, Batoche Books Ltd, Canada, 2001.

Moitra, Shefali, *Feminist Thought*, New Delhi & Kolkata: Munshiram Manohar Lal Publishers Pvt. Ltd. in association with Centre of Advanced Study in Philosophy, Jadavpur University, 2002.

Moore, G. E., "Ethics in Relation to Conduct." *Principia Ethica*, Cambridge University Press, 1903.

Mukherjee, Bidisha. *Redefining Ethics as Care,* Kolkata: Papyrus, 2008.

Noddings, Nel. *Caring: A Feminine Approach of Ethics and Moral Education,* 2nd ed. Berkeley: University of California Press, 2003.

Noddings, Nel*. The Maternal Factor*: *Two Paths to Morality*, California: University of California Press, 2010.

Okin, Susan Moller. "Reason and Feeling in Thinking about Justice." *Ethics* 99.2, 1989, pp. 229-249.

Okin, Susan Moller. *Justice, Gender, and the Family,* New York: Basic, 1989.

Paton, H, J (translated and analysed), *The Moral Law: Kant's Groundwork of the Metaphysic of Morals,* Hutchinson & Co. (Publishers) Ltd. London, 1976.

Rawls, John. *The Theory of Justice*, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1971.

Sen, Pranab Kumar. "The Concept of Rationality." *Reference and Truth*, by Pranab Kumar Sen, ICPR in association with Allied Publishers Ltd., New Delhi, 1991.

Stark, Cynthia. "Decision Procedures, Standards of Rightness, and Impartiality." *Nous* 31 (4), 1997, pp. 478-95.

Sterba, James P., ed. *Ethics: Classical Western Texts in Feminist and Multicultural Perspectives*, Oxford University Press, New York, 2000.

Sullivan, Roger J., *Immanuel Kant's Moral Theory*, Cambridge University Press, Cambridge, 1989.

Thomas, Conor. "Okin's Attempt at a Caring Justice." *Aporia* 32.1, 2022.

Tronto, Joan. *Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care*, New York: Routledge, 1993.

Williams, Bernard, *Ethics and the Limits of Philosophy*, Cambridge university press, 1985.

Young, Iris Marion. "The Ideal of Impartiality and the Civic Public." *Justice and the Politics of Difference.* Princeton University Press, 1990, pp. 96-121.

Young, Iris Marion. *Justice and the Politics of Difference*, Princeton University Press Princeton, New Jersey, 1990.

Internet Resources

Jollimore, Troy, "Impartiality", Stanford Encyclopedia of Philosophy, https://plato.stanford.edu/entries/impartiality/ (online source), cited on 05/01/2022.

Sander-Staudt, Maureen, "Care Ethics", Internet Encyclopedia of Philosophy. https://iep.utm.edu/care-ethics/ (online source) cited on 20/4/2021.

Norlock, Kathryn, "Feminist Ethics", Stanford Encyclopedia of Philosophy. https://plato.stanford.edu/entries/feminist-philosophy/ (online source), cited on 10/05/2019.

Rituparna Choudhury
23.02.2024.